ক্রীতদাসী

অমরেন্দ্র দাস

শ্রীগুরু পাবলিকেশন ২৩এ, নুর আলি লেন, কলিকাতা-১৪

প্রথম (শ্রীগুরু) প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৩২
প্রকাশিকা
শিউলি দাস
২৩এ, নুর আলি লেন
কলি-১৪

শ্যামা প্রেস
২০/বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭

ক্রীতদাসী

ইতিহাস কি সত্য গল্প, না মিথ্যা !

গল্প গল্পকাররা বানিয়ে বানিয়ে লেখে কিন্তু ইতিহাস বানিয়ে লেখা কাহিনী নয় সে সত্যকাহিনী, সেই সত্যিটা পড়তে ভাল লাগে বলে গল্প। কিন্তু সেই ইতিহাস কত রোমাঞ্চকর কাহিনী হতে পারে ১৬২৮ সাল তার প্রমাণ। হুগলীর দাসবাজার আজ অবিশ্বাস্য কাহিনী। একদিন পর্তুগীজরা সেই হুগলীতে তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল এবং ব্যাণ্ডেল গীর্জার কিনারে নদীর ধারে জাহাজে করে মানুষ ধরে এনে বিক্রী করত। সেই মানুষ কিনত নানাদেশের লোক। যারা খৃস্টান হতে চাইত মুক্তি পেত। খৃস্টান করার ইচ্ছা পাদরীদের কিন্তু বোম্বেটে দস্যুদের ইচ্ছা ব্যবসা। এই ব্যবসা করতে গিয়ে তারা যে নৃশংসতার পরিচয় দিত তাই নিয়ে এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ। সেই দাসবাজারে জাহাজে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছিল সম্রাট শাহজাহানের দুটি বাঁদী। উদ্দেশ্য, দিল্লীর অন্তঃপুরের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি। কিন্তু মুক্তি কি তারা পেয়েছিল ? একজন পথেই জীবন হারাল, একজন এই উপনিবেশে ঢুকে পড়েছিল। পর্তুগীজ উপনিবেশ স্বাধীন হলেও তখন সারা ভারতবর্ষের কর্তৃত্ব দিল্লীর বাদশাহের। তিনি হুকুম দিলেন, 'আমার দুটি বাঁদী পালিয়ে গিয়ে তোমাদের ওখানে আশ্রয় নিয়েছে, যদি তাদের ফেরৎ না দাও তাহলে তোপ দেগে উপনিবেশ উড়িয়ে দেব।'

এই কাহিনী, গল্পের মত সত্য। আর এটি লিখতে, 'Portuguese in India, 'The History of Bengal', 'In Bengal Past and Present', 'The Bengal Catholic Herald of India, Cal. 1842' এই বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

কে যেন রাগে ফুলে ফুলে থেমে থেমে চিৎকার তুলে দিচ্ছে, সা—হণ্ট্, হুই—হো !

অন্ধকার আকাশ। চাপ চাপ আঁধারের ঘন কুহেলীতে থমথমে পরিবেশ।

দূরে ভাগীরথীর নিস্তরঙ্গ জল সাপের দেহের মত ভয়াবহতা নিয়ে নিঃশব্দে প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। আরও চোখ মেললে দেখা যায়, সেই জলের ওপর ডিঙি, নৌকা, পানসি, অর্ণবপোত আরও—আরও নানান ধরণের জলযান। তারা নিঃশব্দে কোন এক নতুন আদেশের অপেক্ষায় অন্ধকারে ঘোমটা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আর কিছু দেখা যায় না। সব চুপ, নিস্তব্ধ।

রাত কত হবে কে জানে ? জ্যোৎস্নার আলো বিকশিত হয়ে এই রহস্যময় রাতের সব কিছু সহজ করে দেবে কি না, তারও কিছু ঠিক নেই।

মাঝে মাঝে শুধু অন্ধকারে ঐ একটি শব্দই শোনা যায়, পর্তুগীজ সৈনিকের ঐ সাবধান বাণী। শুনলে যেন শরীরটা রি রি করে ওঠে। বুকে জমে কাঁপন। ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যায়।

শব্দটা ওই দুর্গের মাথা থেকে আসছে। পর্তুগীজ ভাষা। সৈনিকের সাবধান-বাণী। সৈনিক প্রহরা দিচ্ছে অস্থায়ী একটি কাঠের মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে। তার ভারী জুতোর শব্দের বলিষ্ঠ পায়চারী আরও একটি শব্দের ঐক্যতান তুলছে খট্ খট্ খট্।

মাঝে মাঝে আরও এক শব্দ ছুটে আসে তবে বেশীক্ষণ গড়ায় না। কারা যেন হঠাৎ চিৎকার করছে, তারপর গলা চেপে ধরতে সব চুপ।

সেই চিৎকারটা অনুসরণ করে গেলে মেলে একটি খোলা ময়দান। কিন্তু ময়দানে ওকি ? মনে হয় যেন বহু সংসার ! সেখানেই সংসার পেতে দিন গুজরান করে চলেছে।

কিন্তু আর একটু চোখ মেললে দেখা যায়, সংসার নয়, কতকগুলি নারী, পুরুষ, শিশু কি এক যন্ত্রণার মাঝে তালগোল পাকিয়ে বার বার অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে কাকে যেন অভিসম্পাত জানাচ্ছে।

এই পৃথিবী ! হা ঈশ্বর !

তারা মুখে কিছু বলছে না। এ শুধু মনের ভাষা। মুখে কিছু বললেই দূরে গাছতলায় বসে আছে বণিক সর্দার। তার হাতের চাবুক ছুটে আসবে এ পাশে।

তাই কারও মুখে কোন কথা নেই। কেউ কোন কথা বলতে সাহসই করে না। তবু যা বেরিয়ে আসে, বুকের ভেতর থেকে পাক খেয়ে বেরিয়ে আসা একদলা আর্ত দীর্ঘশ্বাস। তারা নিজেরা বের করে না। ভয়ে তারা জবুথবু। বেরিয়ে আসে তারা, যারা নির্ভয়, যারা সমস্ত পার্থিব জগতের বাইরে।

বণিক সর্দার সে শব্দ শুনেও লাফায় ! তার হাতের চাবুক বাতাসে দোল খায়।

রাতেও পরিত্রাণ নেই। খোলা মাঠের ওপর ইতস্তত এমনি পাহারা গাছতলার নিচে অসংখ্য ঘাপটি মেরে বসে আছে।

যদি কেউ পালিয়ে যায় তাকে ধরবার জন্যে এই শ্যেনচক্ষু। কিন্তু কেমন করে পালাবে সে তারা জানে না। পালাবার কোন সুযোগ আছে কিনা তাও ভাবে না। অথচ যাতে কেউ এই ভয়ঙ্কর ফাঁদ পাতা ব্যূহ ছেড়ে পালাতে না পারে, তার জন্যে কড়া ব্যবস্থাই করা আছে।

যুবা, বয়স্ক, বৃদ্ধ, শিশু, মধ্যবয়স্কা নারী সকলকেই এক সুতোয় গেঁথে ফেলে রাখা হয়েছে। শুধু সুন্দরী যুবতীদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। তাদেরও কোমরে দড়ি, দড়িতে ফাঁশ দেওয়া এক একটি গিঁট, সে গিঁট খুলে পালানো শক্ত। তবে তাদের হাত ফুটো করা হয়নি। দু'হাতের তালু ফুটো করে অন্যান্যদের যেমন ক্ষতবিক্ষত করে দড়ি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের তা হয়নি। এমন কি তাদের খাবার ব্যবস্থাও আলাদা।

সেই দিক থেকে আরও একটি মিষ্টি ভয়ঙ্কর গানের মত শব্দ ভেসে আসতে লাগল। কে যেন হাসছে। মেয়েলী হাসির মধুর তীব্রতা ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেন সব ঘনত্ব জটিলতা ফিকে করে দিচ্ছে।

বণিক সিপাই হাসছে। হাতের চাবুক তার মুঠি থেকে শিথিল হয়ে নাগালের বাইরে ঝুলছে।

রাত যেন আরও ঘন। একটি বড় তারার কিছু বাড়তি আলো এসে পড়েছে। এক পাল যুবতী মেয়ে এক জায়গায় বন্ধ। যেন এক দলা আগুন এই অন্ধকার খোলা মাঠে আরও আগুনের শক্তি নিয়ে পোড়াচ্ছে।

পর্তুগীজ সিপাই মুখে সিটি বাজাচ্ছে। সোনালী চুলের মাথায় ঢাকা টুপিটি আরও একটু কপালের নিচে নামিয়ে দিয়েছে। চোখ দুটি জ্বলছে। শ্বাপদের মত সেই দৃষ্টিতে যেন কিসের ইসারা। মুখের সিটিতে পর্তুগালের একটি রমণীয় গানের সুর। সুরে সুরে বাতাস আরও মাতাল।

এ-ইই! চাপা আহবান।

দড়ির মালার মধ্যে যৌবন তরঙ্গ। অনেক মেয়ে। অনেক বয়েসের। তবে বারো থেকে ত্রিশের মধ্যে তাদের পরিধি। শুধু যৌবন দেখে তাদের বেছে নেওয়া হয়েছে। যৌবন ছাড়া রূপও যাদের আছে, যারা বেশি দামে বিক্রী হতে পারে, চড়া লাভে লোভের থলি পূর্ণ করতে পারে, তাদের জন্যে আলাদা সারি!

সেই সারি থেকেই একজন সিপাইকে ডাকছিল।

মেয়েটির চোখ দুটি অন্ধকারে জ্বলছে। যেন দুটি ডাগর চোখে কি এক আগুনের শিখা।

মেয়েটির পরণে সালোয়ার কামিজ, কামিজটা বুক থেকে খানিক সরিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি ফর্সা। দুধের মত গায়ের রঙ। কোমল নিটোল শরীর। স্বাস্থ্যবতী। এক মাথা ঢেউ খেলানো চুলের রাশি বুকের ওপর তুলে নিয়েছে। খোলা ডাগ্নী

বুক। হাসছে মেয়েটি। শাণিত অধরে মুক্তার মত দাঁতের সারি মেলে হাসছে। তার হাসির মধ্যে কি যেন এক গুপ্ত সংকল্প।

এ-ইই সাহেব!

পর্তুগীজ যুবক ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছে। তার মনে পড়ে যাচ্ছে কত—কত কথা। ভাগ্যান্বেষী পথে পা বাড়িয়ে এই ভারতে এসেছিল। তারপর এক জঘন্য বৃত্তির সাথে জড়িয়ে পড়ে স্রোতের মত এগিয়ে চলেছে। জানে না এর শেষ কোথায়? তবু এক এক সময়ে কি যেন তার ইচ্ছে করে?

তার সিটি বাজান বন্ধ হয়ে গেছে। দূরে তাকিয়ে আছে তার আর এক সঙ্গীর দিকে। ঠিক ঠাহর হয় না। সে ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে।

তবু সিপাই এগোয়।

মেয়েটি হাসছে। অন্য মেয়েগুলি মজা দেখছে। হাসছে না কেউ। চোখে তাদের ভয় ও কৌতুকের ইসারা।

মেয়েটি খুশিতে ঘাড় নাড়ে। চোখে দৃষ্টি হানে।

হঠাৎ ওপাশ থেকে গম্ভীর হুঙ্কার ছুটে আসে। অ্যাই!

পর্তুগীজ যুবকটি থমকে দাঁড়ায়। কোমর থেকে পিস্তল বের করে নেয়।

মেয়েটি আবার খিল খিল করে হেসে ওঠে।

ওপাশে সারি সারি কুঠির ছাউনি। গুদামঘর। আরও আরও অনেক নিঃশব্দে পড়ে আছে।

ঘুমিয়ে আছে সব।

গাছে গাছে শুধু বাদুড়ের ঝটাপটি শব্দ। নিশাচরদের তাণ্ডব।

আর দুর্গের ভেতর থেকে ভেসে আসছে কেমন যেন নাচের ছন্দ। পিয়ানো, ড্রাম তারস্বরে বাজছে।

মাঝে মাঝে সুরেলা শব্দটা মৃদু হয়ে যাচ্ছে। এক সুরে ড্রিম ড্রিম করে এক নাগারি বেজে চলেছে। তখন মনে হচ্ছে এবার বুঝি দুর্গের মধ্যে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, আর কোন শব্দ শোনা যাবে না। কিন্তু আবার হঠাৎ একসময়ে জোরে জোরে বাজনা বেজে উঠছে। রক্তের মধ্যে তাণ্ডব জাগিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড হয়ে উঠছে আদিম পিপাসা।

দুর্গের ভেতর থেকে নারীপুরুষের কণ্ঠ ও হাসি উল্লাসের দমকে কেমন যেন চৌচির হয়ে ফেটে পড়তে চাইছে।

একটি অস্থায়ী গির্জাঘর। গির্জাঘরের দালানে কয়েকজন ধর্মযাজক। তারা ঘুমোচ্ছে না, একটি মোমবাতির আলোর সামনে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বসে আছে। সামনে

একটি মেরী মাতার বিমল সৌন্দর্যের আলোক চিত্র। মোমবাতির কম্পমান আলোয় সেই মেরী মাতার মুখের ওপর কি যেন ঐশ্বরিক দ্যুতি।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ ঘুমন্ত এলাকা প্রতিধ্বনিত করে ঘোড়সওয়ারের ছুটে আসা শোনা যায়।

আবার সেই দুর্গের ওপরের সিপাই চিৎকার করে ওঠে।

সা—হল্ট্।

কিন্তু সেই ঘোড়সওয়ার থামে না, দুর্গের দরজার কাছে দাঁড়াতেই শব্দ করে দুর্গ দরওয়াজা খুলে যায়।

ঘোড়সওয়ার বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকে যায়।

সেনাপতি ডি মিলোর কপালে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে।

রাত শেষ হয়ে যায়। পূর্ব আকাশে কে যেন রঙের তুলি বুলোতে থাকে। গাছে গাছে পাখী ডেকে ওঠে। ভাগীরথীর জলেও জাগে আলোড়ন। রাতের সেই সাপের গায়ের মত গঙ্গার জলে সূর্যের ভুবন ভোলানো আলো পরে জল যেন কুমারী মেয়ের মত চোখ তুলে হাসতে থাকে।

ফুটে ওঠে একটি পর্তুগীজ উপনিবেশ। সোনালী চুল, কটা রঙের শরীর, খাকী প্যান্ট-সার্ট পরে গলায় টাই বেঁধে, কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে যারা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা সব পর্তুগালের বাসিন্দা।

কেউ সৈনিক, কেউ ব্যবসাদার। কেউ থাকে দুর্গের মধ্যে, কেউ থাকে ছোট ছোট কুঠির মধ্যে। তাদের আছে ব্যবসা। সে ব্যবসার লেন দেন হয় দেশ বিদেশের সঙ্গে। তবে দুর্গের সঙ্গেও তাদের যোগ আছে। পর্তুগালের রাজার সঙ্গেও তাদের মিতালী আছে কারণ তারাও যে পর্তুগীজ। দেশের জন্যেই নিজের কাজ। আবার নিজের জন্যেই দেশের কাজ। সব এক সূতোয় বাঁধা।

তাই এরা চট্টগ্রাম থেকে হুগলীতে মিলেছে। আধ ক্রোশ তফাতেই সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের বন্দর একদিন হুগলীর চেয়েও উন্নত ছিল। আর ছিল একটি সমৃদ্ধশালী নগরী।

কিন্তু সেই সপ্তগ্রামের সূর্য আজ অস্তমিত। বন্দর আর আগের সেই কোলাহলে মুখরিত নয়।

সেখানেও ছিল পর্তুগীজ অধিকার। তবে কোন দুর্গ ছিল না। ছিল অনেক কুঠি, আর ছোট ছোট পাকা বাড়ী।

পর্তুগীজরা এ দেশের বহু মেয়ে বিয়ে করে এ দেশের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। এমন কি তারা পোষাকও পালটেছে। পায়জামা, ধুতি, বেনিয়ান, জোব্বা, আর মেয়েরা শাড়ী, সালোয়ার, কামিজ কিছুই বাদ দেয় নি। ভাষাও অনেক রপ্ত, তবে জিবের আড়ষ্টতার জন্যে উচ্চারণ ঠিক হয় না।

দিগো রিবেলী বলে একজন উঁচুদরের ব্যবসাদারকে দেখলে আরও চমকাতে হয়। সে বিয়ে করেছে চারটি, একটি বউ শুধু নিজের জাতের, বাকি তিনটি এদেশী। তার

তিন জায়গার। একটি গোয়ার, একটি বেতোরের, আর একটি সপ্তগ্রামের। চট্টগ্রাম থেকেও একটিকে এনেছিল কিন্তু তাকে বিয়ে করার আগে অন্য এক জাত ভাই ফুঁসলিয়ে নিয়ে যায়।

তাছাড়া আছে অগুণতি উপপত্নী। আর সেই সব উপপত্নী কেনা এখানকার দাসবাজার থেকে। চড়া দামে সুন্দরী ডাগর মেয়েছেলে কেনা যেন দিগো রিবেলীর নেশা। প্রত্যহ গিয়ে দাঁড়ায় সেই দাস বিক্রয়ের বাজারের সামনে।

প্রত্যহ কেনে না, যেদিন পছন্দ হয়ে যায় বা দাম নিয়ে রেষারেষি হয়, তখন চড়াদামে তুলে নিয়ে যায় সেই পুষ্ট দেহের ডাগর গোলাপ কুসুমটি।

এমনি আনতে আনতেই অন্তঃপুরটা যেন হারেম বানিয়ে ফেলেছে।

তা হোক্ গে, তার জন্য সে ভাবে না। অর্থের প্রাচুর্য যেমন বাড়ছে, তেমনি খরচ করার পথও তো ভাবা দরকার!

দিগো রিবেলী বয়সের দিক দিয়ে একটু বৃদ্ধই হয়ে আসছে। তার জন্যেও সে ভাবে না। বহুদিন ভারতে এসেছে। বহু উত্থান পতন দেখেছে। দিল্লীর সিংহাসনে আকবর থেকে শুরু করে জাহাঙ্গীর, তারপর শাহজাহান।

শাহজাহান যখন পিতার ভয়ে বিদ্রোহী হয়ে পালিয়ে এসেছিল, তখন হুগলীর সুবেদার মাইকেল রোডরিগুয়েজ। মাইকেল তখন সম্রাটকে সাহায্য করেছিল, তার সঙ্গে সেও ছিল। তার হাতে ছিল তখন কিছু শিক্ষিত সেনা। সে তখন মনে প্রাণে সৈনিকই ছিল। তারপর একদিন সৈনিকের পোষাক ছেড়ে এ দেশের পোষাক পরল। এ দেশের মানুষদের সঙ্গে মিশে ব্যবসা ফাঁদলো। চালের ব্যবসা। তারপর চিনি। এ দেশেরই মাল; বিভিন্ন জায়গা থেকে কিনে আর এক জায়গায় বেচা।

তারপর আরাকানের মগদের সঙ্গে আর এক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ল। যদিও ব্যবসা করেই তাদের পয়সা। তবু সে কথা আজ আর মনে করতে চায় না। সেই ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন জীবনের উত্থান পতনের ইতিহাস, কত ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্যের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে।

আজ দিগো রিবেলী সুখী ও সম্ভ্রান্ত ধনী। হুগলীর এই অঞ্চলের যতগুলি স্বাধীন পর্তুগীজ অধিবাসী আছে তাদের মধ্যে অন্যতম।

আর তার পাকা কুঠিটিও দেখবার মত। অনেকটা ফতেপুর সিক্রীর হাওয়া মহলের ঢঙে সৃষ্টি। সেই কুঠির সঙ্গে তার বড় বড খড়ের চালের গুদাম ঘর, তারই মধ্যে আছে যত গুদামজাত মাল।

অনেক জমিও দিগো রিবেলী চাষ করত। ক্রীতদাস দ্বারা করাত।

লম্বা, রোগা, পাকানো শরীরের মানুষটি। মাথায় সোনালী চুল ছোট করে ছাঁটা। পরণে জাতীয় পোষাকই। তবে মুখের হাসিটি ও দেশের নয়, এ দেশের। মদ খেয়ে সর্বদা টং হয়ে থাকে। কিন্তু হাসিটি পরিবেশন করতে ভোলে না।

মদের জন্যে তাকে সর্বদা জাহাজ ঘাটায় শকুনের মত ঘুরতে হয়। জাহাজ এলেই প্রথম সে মদ সওদা করবে। বিলিতী মদের নেশা সে কিছুতে ভুলতে পারে না।

আর একটি বদ অভ্যেস তার আছে, সারাদিন ঘোরাঘুরি করতে করতে তার দরকার একটি সরু বিচালীর খড়। ডগা ধরে মুখে নিয়ে চিবুবে, তারপর গালের এপাশ ওপাশ কতক্ষণ করে ফেলে দেবে। আবার একটি পথ চলতে চলতে খড়ের গাদা থেকে তুলে নেবে।

সে দিন সকাল হতেই দাস বিক্রয়ের খোলা মাঠে গোলমাল শুরু হয়ে গেল। প্রত্যহ সকাল থেকেই চলে এই ব্যবসা। তারপর দিন শেষে অন্ধকার না নামলে বিক্রয় বন্ধ হয় না।

কিনতে বহু জায়গা থেকেই লোক আসে। সেদিনও আসতে লাগল নৌকা, বজরা, পানসি করে।

বন্দরের মাল খালাসী ঘাটে অন্য ব্যবসার কেনা বেচাও চলতে লাগল।

আর এই সময়ে সেই খোলা মাঠে দস্যুবণিক পর্তুগীজ সর্দার চিৎকার লাগিয়ে দিল। প্রত্যহ এমনি চিৎকারই সারাদিন চলে।

আর ঠিক ভেড়ার পালের মত মানুষের দল, হাতে ফুটো করা গর্তের মধ্যে দড়ির বাঁধনে বন্ধ থেকে, রক্ত, পুঁজ ও দগদগে ঘায়ের জ্বালা নিয়ে, রোদে পুড়তে পুড়তে অনাহারের ক্লান্ত শরীরে ব্যাকুল চোখে ক্রেতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তখন ঐ জঘন্য অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য নীরব কাতর প্রার্থনা।

কিন্তু ক্রেতা তার প্রয়োজনের দিকেই এগিয়ে চলে।

আর পর্তুগীজ ধর্মযাজকরা এসে ঢোলা জামা পরে দাঁড়ায়। বলে না কিছু, শুধু বিড় বিড় করে কাকে যেন প্রার্থনা জানায়।

কেউ কেউ কি ভেবে এগিয়ে আসে—খৃষ্টান হবে? খৃষ্টান হলে মুক্তি পাবে পর্তুগীজ প্রভুর কাছে থেকে ভূমি ও চাকরী, সুখে জীবন যাপন করবে, আর দাস থাকতে হবে না।

অনেক জ্বালা ও যন্ত্রণা। অনেক অভিশাপের মালা পরে অবিচার জীবন। তবু ধর্ম ত্যাগ করতে মন কারুর সায় দেয় না।

আর নিজের গ্রামে ফিরতে পারবে না। পাবে না সেই হারিয়ে যাওয়া আত্মীয় স্বজনকে। সে গ্রাম দস্যুরা রাতারাতি পুড়িয়ে জ্বালিয়ে নিয়ে এসেছে সেই গ্রামের নরনারী, শিশুকে। তারা একসঙ্গে কেউ নেই, হরির লুটের মত কে কোথায় ছিটকে গেছে, কার ভাগে কে পড়েছে, চলে গেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দস্যু বণিকের নৌকো বোঝাই হয়ে। তারপর এই নানা দেশের দাসবাজারে।

প্রত্যহ যেমন যুবতী মেয়েদের আটক স্থানে ক্রেতার ভীড় হয়, আজও সেই দিকে খদ্দের এগিয়ে চলল।

সূর্য ভাগীরথীর স্রোতের ওপর পড়ে দামাল কিশোরীর মত খেলা করছে। বন্দরে দুর্গের ত্রিকোণ মুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বিদেশী জাহাজ। জাহাজের মাল সব দুর্গের মধ্যেই জমা হচ্ছে। তার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রও কম নয়।

দুর্গটা এমনভাবে তৈরী করা, যার তিনভাগ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, এক ভাগ জলের দিকে।

জাহাজ এসে নোঙর করলে, আর তার মাল দুর্গের মধ্যে ঢুকলে বাইরে থেকে কারুর বোঝবার উপায় নেই।

সেদিন এরই পাশে পাশে অসংখ্য বাণিজ্য নৌকা। কোন্টা এসেছে দক্ষিণ বাংলা থেকে। কোন্টা সন্দীপ, বাকলা, সুন্দরবন, বালেশ্বর, বেতোড়, আরও এগিয়ে গেলে চট্টগ্রাম, আরাকান, দক্ষিণের গোয়া।

সবাই কাজে এসেছে। বিনা কাজে কেউ হুগলি বন্দরে বেড়াতে আসেনি।

সেই ঘাটের ধারেও নানা ভাষার নানা উত্তেজনা।

যত বেলা বাড়বে, রোদের তাপ বাড়বে। যদিও এটা বসন্তকাল। তবু সূর্য মাথার ওপর উঠে পড়লে কেমন যেন তির্যক চোখে চায়।

আর সেই রক্ত চক্ষুতে ক্রেতা বিক্রেতার মাথা গরম হয়ে ওঠে। তাই সকালের এই ঠাণ্ডা আলোয় সকলেই তড়িঘড়ি কাজ সারতে চায়, তাই গোলমালটা একটু বেশী। সৈনিকদের কাজও বেড়ে যায়।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্যে বন্দুক হাতে তাদের টহল দিতে হয়। এ পর্তুগীজ উপনিবেশ। এখানকার অধিকার পর্তুগীজদের।

স্বয়ং বাদশা আকবর এই ক্ষমতা তাদের দিয়ে গেছেন। সে ফরমান নাকি দুর্গের মধ্যে একটি লোহার সিন্দুকে সযত্নে রাখা আছে।

সপ্তগ্রাম ও হুগলী। পর্তুগীজরা তাদের নাম দিয়েছিল, পোর্টগ্রাণ্ডি, পোর্ট পিকুনো। চট্টগ্রামকে যেমন পর্তুগীজরা ছতিগান বলত, অর্থাৎ ছিটাগান থেকে ছতিগান, তেমন সাতগাঁওকে সতিগান।

যে পাশে রূপসীদের দড়ির বাঁধনে ধরে রাখা হয়েছিল সেই দিকে ভীড়টা গিয়ে থমকে দাঁড়াল। রূপসী যারা নয় অথচ যৌবনবতী, তাদের আলাদা একটি দল। আর যারা রূপসী, যাদের উপস্থিতিতে সেই ঘাস ওঠা নেড়া মাঠ আলোয় ভরে আছে, তাদের একটি দল ভাগে ভাগে ক্রেতার আসার অপেক্ষায় ছিল।

রাতের সেই পাহারাদার পর্তুগীজ যুবকটি, সে তখনও যেন কেমন চোখ করে তাকিয়ে ছিল ঐ রূপের হাটে।

রূপসী মেয়েরা ক্লান্ত, অবসন্ন, বাসী ফুলের মত ম্লান, তবু যেন তাদের শরীর ঘিরে কি? ক্রেতা লুব্ধ চোখে তাকিয়েছিল। কেউ থলির রেস্ত গুণছে। রেস্ত কুলোলে তুলে নিয়ে যাবে একটিকে।

তারপর, তারপর আর ভাবনা নয়।

আর যারা শুধু যুবতী মেয়ে কিনতে এসেছে, হয়ত বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ধান

ভাঙানোর কাজ করাবে, দরকার হলে কখনও কখনও সেবাদাসীও করতে পারবে, তাদের শুধু গড়ন, আর তার মধ্যে একটু রূপের তারতম্য খুঁজছে। কারো মুখটা ভাল, শরীরটা বড় পলকা, কারো শরীরটা নিটোল, মুখটি ভাল নয়। নাকটি কেমন যেন।

পর্তুগীজ বণিক সর্দার চাবুক হাতে, ভুঁড়ি থেকে প্যাণ্টটা তুলে এঁটে, চাবুক ঘুরিয়ে চিৎকার দিচ্ছে—তাজা মেওয়া, আসলি জহর, বারো থেকে ত্রিশ বছরের আওরত।

হাসছে ক্রেতা। ওটার কত দাম?

বিশ, বাইশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ।

দিগো রিবেলী এসে দাঁড়াল সেই রূপের হাটে। মুখে একটি খড়ের ডগা। চিবুচ্ছে যেন চুইনগামের মত।

সে চোখ তুলে হাসছে। পরখ করছে রূপসীগুলোকে। এক, দুই, তিন···না, না। সবাই রূপসী কিন্তু সবাইকে যেন পছন্দ হয় না। এক পলকে দেখলে যাকে মনে ধরা যায় তাকে যেন খুঁজছে দিগো রিবেলী। হঠাৎ সেই রাতের মেয়েটির কাছে এসে দৃষ্টি তার থমকে দাঁড়াল।

পাহারাদার পর্তুগীজ যুবকটিও তাকিয়েছিল। তার চোখে যেন কি এক মন হারানো নেশা। টুপিটা আরও কপালের নিচে নামিয়ে দিয়েছে। দৃষ্টিতে লোভের ইসারা।

এরই মধ্যে অন্য এক ক্রেতার মেয়েটি পছন্দ হয়ে গেল। সে বণিক সর্দারের সঙ্গে দাম নিয়ে দর করতে লাগল।

কিন্তু দিগো রিবেলী গিয়ে সর্দারের সামনে দাঁড়াল।

আমি আরও দশ টাকা বেশী দেবো।

ক্রেতা, ভ্রূকুঞ্চিত করল।

আমিও দেব আরও বিশ টাকা।

দিগো রিবেলীও দর বাড়াল।

বাড়তে বাড়তে কেমন যেন রেষারেষির মধ্যে গিয়ে পড়ল। কেমন যেন একটা নেশার মত। দিগো রিবেলী এই নেশায় অভ্যস্ত। বহু যুবতী রূপসীকে সে এমনি ভাবে কিনেছে। তার পছন্দের ওপর কারও হাত পড়লে সে কখনও ছেড়ে দেয় না।

এবারের ক্রেতা ছিল দক্ষিণ বাংলার এক অবস্থাপন্ন অধিবাসী কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত দিগো রিবেলীর সঙ্গে পারল না।

তবু দুজনের মধ্যে সে এক প্রতিযোগিতা শুরু হল। ভীড় এসে থমকে দাঁড়াল এই দুজনের পাশে। উত্তেজনা ধাপে ধাপে ওপরে উঠতে লাগল।

দক্ষিণ বাংলার অবস্থাপন্ন অধিবাসীরই আস্ফালন বেশী। বয়েসে তরুণ, মেয়েটি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে তারই যেন উত্তেজনা চরম। কপালে ঘাম। চোখেও লোভের ইসারা। সে লাফিয়ে লাফিয়ে দর বাড়িয়ে চলেছে। ভাবছে প্রতিদ্বন্দ্বী তার দরের কাছে পারবে না।

কিন্তু দিগো রিবেলীকে সে জানে না। জানে নিলাম সর্দার। আর পর্তুগীজ অধিবাসীরা।

ভীড়ের মধ্যে অনেকেই এই কৌতুক তারিয়ে তারিয়ে দেখছিল।

কেউ বলল, এতো ঝামেলায় কাজ কি বাপু! মেয়ের তো মরুভূমি হয় নি। কত রূপসী মেয়ে রয়েছে তাদের একটাকে নিলেই হয়।

কিন্তু এমনি রেষারেষিই মাঝে মাঝে লেগে যায়।

দুজনেই একজনকে চায়। আর নিলামদারের দর বেড়ে যায়। নিলাম সর্দার এই চায়। তার দর বাড়ুক। দামের বেশী টাকা আসুক। সেও হাসে খল খলিয়ে।

দিগো রিবেলীর মনে কোন উত্তেজনা নেই। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন মনে হয় না মেয়েটার জন্যে তার কোন আগ্রহ আছে। অথচ দর বাড়াচ্ছে সেও।

দক্ষিণ বাংলার অধিবাসী গলা চড়িয়ে যখন দর তুলে দিচ্ছে, তখন সময় নিচ্ছে দিগো রিবেলী অনেক।

নিলামদার চেঁচাচ্ছে। পঞ্চাশ এক, পঞ্চাশ দুই।

দিগো রিবেলী তখন মুখ থেকে খড়ের ড়গা বের করে ফেলেছে। সিক্সটি।

তখন নিলামদারের আরও চিৎকার কিন্তু দক্ষিণ বাংলার অধিবাসী তাকে চেঁচাতে দেয় না। সেও বলে ওঠে, আশী।

এইভাবে চলতে চলতে এক সময়ে টাকার অঙ্ক যেন সব মেয়েগুলি কেনবার দামে এসে পৌঁছোয়।

এদিকে ভীড়ের মধ্যেও উত্তেজনা জাগে।

দাস বাজারে ভীড় এই বাজার চলাকালীন। কিন্তু এদিনের ভীড় যেন এখানেই এসে থমকে দাঁড়ায়।

সবাই সব কাজ ভুলে যায়। ভুলে যায় কি সওদা করতে এসেছিল?

এমনটা তো খুব একটা দেখা যায় না।

এই রেষারেষি। একটা মেয়ের জন্যে এই কাঙালপণা। একজন বুড়ো, একজন তরুণ। তরুণের দাবীই স্বীকার্য কিন্তু ঐ বুড়োটা?

পর্তুগীজ অনেক তরুণ সাহেবও ঘুরছিল কিন্তু তারা দিগো রিবেলীর কাণ্ড দেখে হাসে। তাদের ভাষায় পরস্পরকে বলে, রিবেলী আমাদের জাতের দুর্ণাম করল।

এদিকে দক্ষিণ বাংলার তরুণের পুঁজিতে টান পড়ে। সে আর দর বাড়াতে পারে না। যা বাড়ায় তাও ধীরে ধীরে।

দিগো রিবেলী তা করে না, সে লাফিয়ে লাফিয়ে দর চড়ায়।

এক সময়ে দক্ষিণ বাংলার তরুণ থেমে পড়ে। সে লোভের চোখে বয়স্ক দিগো রিবেলীর মুখের দিকে তাকায়।

দিগো রিবেলী তখন খড়ের ডগা মুখে পুরে দিয়েছে। পুরু ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা।

দক্ষিণ বাংলার তরুণ না পাওয়া মেয়েটির ঢলো ঢলো মুখের দিকে একবার লুব্ধ চোখে তাকিয়ে ক্রুদ্ধভঙ্গীতে ভীড় কাটিয়ে অন্য পথ ধরে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভীড় থেকে কে যেন বলে ওঠে, বেচারী।

হাসির একটা হল্কা ছুটে ছুটে বেড়ায় ফাঁকা জায়গার চারিদিকে।

এতক্ষণ অন্য মেয়েদেরও বিক্রী বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দিগো রিবেলী নিলাম সর্দারের হাতে গুণে গুণে টাকা দেয়।

মেয়েটি দিগো রিবেলীর সম্পত্তি হয়ে যায়।

মেয়েটিও খুশি। মেয়েটি এতক্ষণ বড় বড ডাগর চোখ মেলে তার বিক্রী বাণিজ্য দেখছিল। কে জেতে তারও কৌতূহল? তার কারও ওপর কোন আগ্রহ নেই। শুধু বৃদ্ধ দিগো রিবেলীকে দেখে তারও মনের মধ্যে বিস্ময় জাগছিল।

ওদিকে সেই পর্তুগীজ পাহারাদার যুবকটি। কেমন যেন চোখে তাকিয়ে আছে। তাকে নিয়েই এতক্ষণ খেলছিল মেয়েটি।

তারপর দিগো রিবেলীর সম্পত্তি হয়ে গেল। মেয়েটি আর কিছু ভাবে না।

দড়ির বাঁধন থেকে ছাডা পেয়ে নাচের মত পায়ে ছন্দ তুলে দিগো রিবেলীর পাশে এসে দাঁড়াল।

তারপর সেই পর্তুগীজ পাহারাদার যুবকটির দিকে কটাক্ষ দৃষ্টির সাথে হাসি পাঠিয়ে দিয়ে দিগো রিবেলীকে বলল, সাহেব, তুমি তো বুড়ো, তুমি আমাকে কিনলে কেন? আমাকে নিয়ে কি করবে? মেরীমাতার মত পুজো করবে? এই বলে মেয়েটি পুজো করবার মত জোড় হাত করল। তারপর শরীর দুলিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল।

নিটোল শরীর। তার সঙ্গে স্বর্গীয় রূপ যেন হাজারো জৌলুসের কণা দিয়ে বেঁধে রেখেছে কমনীয় শরীরটা।

দিগো রিবেলী সত্যিই ভাবতে লাগল। তাইতো একে দিয়ে সে কি করবে? এ যে দামাল, দুষ্টু, একটা ক্ষেপা হাস্তি, কিম্বা নদীর স্রোতের ধাবমান গতি। দিগো রিবেলী খড়ের ডগা চিবুচ্ছিল। হঠাৎ থু থু করে ফেলে দিয়ে, বাঁ হাতের তালুর উলটো পিঠ দিয়ে মুখ মুছল। ন্যাণ্ডো গেঞ্জি পরা ফসা লোমশ শরীর। নীল নীল শিরাগুলি বেরিয়ে পড়েছে! বুকে কটা ঘন লোম। দু'হাতের কবজির ওপর থেকে কনুই পর্যন্ত নানা চিত্রবিচিত্র উল্কির নক্সা। দিগো রিবেলী তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। সোনা রোদের আলো পড়েছে সোনালী কদম ছাঁট চুলে।

মেয়েটিও তাকিয়েছিল কিন্তু কেমন যেন তার দৃষ্টিতে মাদকতা। সে যে ভয় পাওয়া অন্যান্য মেয়েদের মত, তা নয় বরং খুশি। খুশিতে সে মাঝে মাঝে টেরচা চোখে সেই পর্তুগীজ যুবকটির দিকে তাকাচ্ছিল।

ভীড়ের চাপ আরও বাড়ছে। দর কষাকষির শব্দ ভেসে আসছে।

কান্না বাতাসে ছড়াচ্ছে। আর্ত চিৎকারের প্রতিধ্বনি হঠাৎ আছড়ে পড়ে আবার কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

পর্তুগীজ সর্দারের চাবুকের শব্দ হচ্ছে। সপাং সপাং। মানুষের চামড়া শক্ত যেন গণ্ডারের চামড়ার বুকে চাবুকের আঘাত পড়ছে। ফুলে ফুলে উঠছে শিশুর কোমল শরীর। লাল চামড়ার বৃদ্ধের শরীর কেটে কেটে রক্ত ঝরছে।

খৃষ্টান পাদরীরা ঘুরছে টাকার থলি নিয়ে। বাতাসে শুধু একটি কথাই ছড়াচ্ছে।

খৃষ্টান হবে, খৃষ্টান হবে। খৃষ্টান হলে মুক্তি পাবে।

তবু ধর্মত্যাগ করতে যেন অনেক দ্বিধা। কেউ কেউ আর অত্যাচার সহ্য করতে পারছে না। চোখ দিয়ে জল বেরচ্ছে না, জল শুকিয়ে যেন রক্তকণা নেমে আসছে।

তাই আবার দলে দলে এগিয়ে আসছে ধর্মত্যাগ করতে। দাসত্ব শৃঙ্খল পরে গোলামী করার চেয়েও তো এ ভাল! অন্তত বাঁচার চেয়ে মুক্তি বোধহয় প্রয়োজন। বুক ভরে বাতাস নিতে পারলে বুঝি প্রাণের শান্তি মিলবে।

এই যখন বর্তমানের জীবন, কতকগুলি বিদেশী দস্যুবণিকের হাতে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ, তাই দলে দলে এগিয়ে আসছে খৃষ্টান পাদরীর কাছে।

আর চলছে ক্রীতদাসরা মুক্তির আশায় দূরে একটি বড গির্জার দিকে। যেটা গতরাত্রে দৃষ্টিগোচর হয়নি।

ব্যাণ্ডেল গির্জা।

লেডি অফ রোজারি। খৃষ্টানদের দেবীমূর্তি। মেরী মাতার পূণ্যস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি। মুমূর্ষু মানুষ রক্তাক্ত শরীরে মুক্তির আশায় সেই দিকে চলেছে।

দীর্ঘ গির্জাবাড়ীর সুবিশাল স্তম্ভ। থমকে থেমে তাকিয়ে যেন নিঃশব্দে মানুষকে ডাকছে। এসো, এসো, এর মধ্যে আছে মুক্তি।

ভাগীরথীর জলে পণ্যবাহী জাহাজ চলেছে। চলেছে ক্রীতদাস মানুষের মিছিল নিয়ে আর এক দস্যু। এ বাজার থেকে ক্রীতদাস কিনে অন্য বাজারে বিক্রী করবে বলে তুলে নিয়েছে নৌকো ভরে।

কে যেন কুঁই কুঁই করে কেঁদে উঠল। কাঁদছে অনেকেই। মেয়েলী কান্নার মিঠেল সুর গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। কেউ আবার না কেঁদে কেশর ফুলিয়ে এগিয়ে আসছে। চোখে আগুন জেলে সর্দারের দিকে চাইছে। তারপর কাসর ভাঙা কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠছে।

তুমি কেন আমাকে বেচবে? দস্যু কোথাকার, পাজি, ছুঁচো ফিরিঙ্গী!

বিচিত্র শব্দে যে ঘোমটার মধ্যে থেকে কাঁদছিল, দিগো রিবেলীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চঞ্চল মেয়েটি তাকে দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল।

অদ্ভুত সেই মেয়েটির ঘোম্‌টা ঢাকা মুখটি। সদ্য বিবাহিতা কচি বয়সের ডাগর শরীরটি। হয়ত ফুলশয্যা হবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দস্যুরা গ্রামে। কিম্বা এক রাতের পর সে জেনেছে নরনারীর কামনা-বাসনা।

দিগো রিবেলীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির মনে পড়ল। ঐ বধূটি যে দস্যু জাহাজে ছিল, সেও ভাগ্যচক্রে সেখানেই স্থান পেয়েছিল।

একটি পর্তুগীজ দস্যু লালসার চোখে কচি মেয়েটির ঘোম্‌টা ধরে টেনেছিল। কিন্তু

পারেনি সে তার ঘোম্‌টা খুলতে। ঘোম্‌টা না খুলতে পেরে ধস্তাধস্তির মধ্যেও পর্তুগীজটা তার ঘোম্‌টার ওপর বার বার চুম্বন এঁকেছিল।

গত রাত্রেও ঐ মেয়েটিকে ঘোম্‌টা খুলতে বলেছিল সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য মেয়েরা। কিন্তু সে খোলেনি।

রাগ করে অন্যান্য মেয়েরা ব্যঙ্গ করে বলেছিল—আহা লজ্জাবতী লতা যেন! এদিকে পাছার কাপড় সরে যাচ্ছে, ঘোম্‌টা টানছে।

সেই মেয়েটিকেই একটি পর্তুগীজ সওদা করতে চাইল।

চাওড়া লাল পেড়ে কাপড় পরে আছে। ঠিক একটি গ্রাম্যবধূর ছোট্ট চেহারা। অল্প বয়সের বিবাহিতা। কলসি কাঁখে পুকুর ঘাটে পাঠিয়ে দিলেই হয়।

তা সেই পর্তুগীজ খদ্দের ঘোম্‌টা খুলতে বললো।

বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে বেশ ছোটখাট মানুষটি। মুখখানি নিশ্চয় সুন্দর ও কচি ডাগর মেয়ে। এই ভেবে পর্তুগীজ খদ্দের ঝুঁকেছে। তা সেই পর্তুগীজ খদ্দের নিজেই এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে মেয়েটির ঘোম্‌টা খুলতে চাইল।

কিন্তু মেয়েটি ঘোম্‌টা না খুলে সরে দাঁড়িয়ে বিচিত্র শব্দে ঘোম্‌টার মধ্যে কাঁদতে লাগল।

দস্যু সর্দার হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

অ্যাই, অ্যাই, ঘোম্‌টা খুলবে, না জোর করে খুলে দেব?

দিগো রিবেলী তার কেনা মেয়েটির দিকে তাকাল। রোদ বাড়ছে। মেয়েটাকে আলভার হাতে সঁপে দিয়ে একবার লবণের গোলায় যেতে হবে। সেখানে একটি নেটিভ ক্রীতদাসকে শায়েস্তা করতে হবে। বড্ড গোলমাল বাঁধিয়েছে।

মেয়েটি হঠাৎ বলল, আমাকে খৃষ্টান করবে তো?

দিগো রিবেলী তার দিকে বিস্ময়ে তাকাল। খৃষ্টান হবে?

হ্যাঁ, আমার খৃষ্টান হতে বড় সাধ!

রিবেলী বুঝতে পারল না মেয়েটির কথার অর্থ। জোর করে খৃষ্টান করবার জন্যে কত মেহনত করতে হয়, আর এ বলে কি? মেয়েটির যেন সবই বিচিত্র।

হঠাৎ তার চোখ গেল রৌদ্রে ঝলমল লম্বা কামিজের দিকে। কেমন যেন জরি বসানো। সাচ্চার কাজ করা, খুব দামী। সন্দেহ হল, তবে কি এ কোন আমীর ওমরাহের ঘর থেকে ছিনিয়ে আনা আওরত! দিগো রিবেলী সন্দিগ্ধ হয়েই জিজ্ঞেস করল, তোমার ঘর কোথায় ছিল? তুমি কে? তোমার পরিচয় কি?

কথার ধরণে মেয়েটি চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে হেসে বলল, অতো জিজ্ঞাসায় দরকার কি সাহেব? তুমি কিনেছ, এখন আমি তোমার। তাড়াতাড়ি তোমার ঘরে নিয়ে যাবে কিনা বলো, নাহলে আর আমি রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়তে পারি না। এই বলে মেয়েটি মাটিতে বসে পড়তে চাইল।

দিগো রিবেলী তাড়াতাড়ি তার নরম হাতটি চেপে ধরল। বলল, অন্তত তোমার নামটাও তো বলবে? কি বলে ডাকবো?

মেয়েটি এবার দিগো রিবেলীর হাতের মধ্যে তার হাতটি সঁপে দিয়ে মুখ ভরিয়ে হাসল। তারপর বলল, হ্যাঁ, একটা নাম আমার আছে। সেটা ভুলতে পারিনি। তবে তুমি তো সাহেব আরেকটা নাম দিতে পার।

না, তোমার সেই নামটা বল। এদেশের মেয়েদের নামগুলো বড় মিষ্টি।

মেয়েটি আবার চপল কণ্ঠে খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, এ দেশের মেয়ের নামই শুধু মিষ্টি সাহেব, আর কিছু নয়?

দিগো রিবেলী হতবুদ্ধি হল। শিরার মধ্যে যেন জমে যাওয়া রক্তটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, তারপর বলল, চলো চলো ঘরে গিয়েই কথা হবে। লোকগুলো যেন তোমার দিকে কেমন চোখ করে তাকিয়ে আছে।

লোক তাকিয়েছিল। একটি বয়স্ক লোকের সঙ্গে ভরা যৌবনের একটি মেয়ে। কারও কারও মনে লোভের ইসারা জাগছিল। এমন চোখে লাগার মত ভরাট যৌবন যেন বড় একটা দেখা যায় না।

মেয়েটিও দেখছিল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে অন্য ভাবের খেলা।

হঠাৎ বলল—হ্যাঁ তাই চলো। মেয়েটি আর জোরে হাসল না। মুচকি হাসি ঠোঁটের প্রান্তে ঝুলিয়ে দিগো রিবেলীর হাতটা চেপে ধরে চলতে লাগল।

বাতাস ভারী হয়ে উঠল। রোদের তেজ গিয়ে জমছে দুর্গের মাথার ওপর। দুর্গের মাথার গম্বুজে উড়ছে পর্তুগীজ রাজার নিশানা। দলে দলে লোক চলেছে মুক্তির আনন্দে ব্যাণ্ডেল গির্জার দিকে। নারকেল গাছের ঢ্যাঙা মাথার ওপর লম্বা লম্বা পাতার ফাঁকে শকুন বসে তাক করে আছে।

সেই পর্তুগীজ যুবকটি দিগো রিবেলীর পিছু পিছু ক'পা গেল।

তার দিকে তাকিয়ে চপল মেয়েটি জিব ভেঙাল।

যুবকটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর এগোল না।

দিগো রিবেলী চলে গেল মেয়েটিকে নিয়ে।

দিগো রিবেলী আবার জিজ্ঞাসা করল তোমার নাম কি?

মেয়েটি যেতে যেতে বলল—আমার নাম হীরা।

দিগো রিবেলী তাকিয়ে বলল, তুমি হিন্দু?

হীরা মাথা নাড়ল।

কিন্তু হিন্দুমেয়ে মুসলমানের পোষাক পরেছে কেন রিবেলী বুঝতে পারল না।

দাস বাজার তখন পূর্ণোদ্যমে চলেছে। বহু সওদা বিক্রী হয়ে গেছে, আরও হচ্ছে। যা পড়ে আছে তাও বোধহয় থাকবে না।

আজকের বাজারটাই কেমন ভাল ছিল। খদ্দেরও এসেছিল মন্দ নয়। এক

একদিন এমনি হয়। বণিকদের আর লালটুপি ঘুরিয়ে চাবুক চালাতে হয় না। যেন ভেড়ার চেয়েও এই মানুষেরা বেয়াদপ। এক একজন কত ভাল, কত শান্ত, শুধু তারা কাঁদে। তা কাঁদুকগে, কান্নার জন্যে তো অসুবিধে হয় না কিন্তু এক একজন এমন যে বনের হিংস্র পশুর মত। কিছুতে পোষ মানতে চায় না। এক এক সময় পিস্তল তুলে গুলি ছুঁড়ে দিতে হয়। লটকে পড়ে বেয়াদপরা। তাতে লোকসান হয় বেশী। মরা মানুষ তো কেউ কেনে না। মরা মানুষ শকুনের মজা হয় খাওয়ার জন্যে। তবে মারতে কোন বণিকই চায় না। মরে যাক্ এমন অত্যাচার করার চেয়ে মেরে মেরে শায়েস্তা করায় লাভ বেশী।

মেয়েরাই যেন জ্বালায় আরও বেশী।

এক একটি মেয়ে যেন লঙ্কার মত। যুবতী মেয়েদের নিয়ে অতো ভাবতে হয় না। তাদের এক আশা। তাছাড়া এদেশে মেয়েদের লজ্জাই চরম। ভাবতে হয় বেশী বয়সের গিন্নী ধরনের বয়স্কাদের নিয়ে। সংসারে হাবুডুবু খাওয়া কাতরে ওঠা অভিজ্ঞা গিন্নী। জাহাজে উঠেই রুখে দাঁড়াল, আর তেমনি মুখরা।

বিখ্যাত জলদস্যু পর্তুগীজ হার্মাদ পেড্রো রোদে পুড়তে পুড়তে সেই কথা ভাবছিল। বাংলাটা এখনও রপ্ত হয়নি। তাছাড়া এই বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা যেন কেমন? কেমন যেন শুনে কিছু বোঝা যায় না। সব ইঙ্গিতে সারতে হয়।

দেশের মাটি ছেড়েছে সাত বছর। দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে প্রথম ল্যাণ্ড করেছিল। তারপর এই চলেছে দিনের পর দিন। শুধু মানুষ ধরা। জাহাজ নিয়ে জলে জলে ঘোরা। ওৎ পেতে থাকা নদীর পাশাপাশি গ্রামের দিকে। তাল বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়া নিরীহ গ্রামের ওপর আগুন জ্বালিয়ে দিলে বেশ থ্রিল লাগে। মানুষের চিৎকার, কান্না। সে এক বীভৎস কাণ্ড। অ্যাডভেঞ্চারও হয়।

নিশুতি গ্রাম। চলতে চলতে নৌকো ভিড়িয়ে দলবল নিয়ে চুপিসারে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়া।

প্রথম প্রথম খুব ভয় করত। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শুকনো আম পাতা মাড়িয়ে সাপের গা ডিঙিয়ে, জ্যোৎস্নার আলোয় ভাসতে ভাসতে, জোনাকির আলো দেখতে দেখতে, ঝিঁ ঝিঁ পোকার গান শুনতে শুনতে; একবার একটি শিয়ালের অদ্ভুত ডাক শুনে পেড্রো চমকে উঠেছিল।

তখন সে এদেশে নতুন। ভাল করে এদেশের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। শিশুর চোখের মত কৌতুহলী দৃষ্টি। সে সময়ের একটি স্মৃতি আজও মনে আছে। গ্রামের মধ্যে তখন ঢুকে পড়েছে।

সেদিনও নিশুতি রাত। একটি বিয়ে বাড়ীর সামনে গিয়ে তারা দাঁড়ায়। তখনও কিছু পেট্রোমাক্সের আলো সেই বিয়ে বাড়ীর দালানে জ্বলছিল। তবে মানুষ খুব একটা জেগে ছিল না।

এঁটো কলাপাতা পড়ে আছে বাড়ীর সামনে আগাছা জঙ্গলে। ক'টি কুকুর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে পাতাগুলো টেনে টেনে বের করছে।

পেড্রোর পেছনে তার দলবল। দলবল তৈরা। সঙ্গে বিবিধ আগ্নেয়াস্ত্র, আগুন জ্বালাবার জ্বালানী। বাঁধবার জন্যে দড়ি। আঘাত করবার জন্যে ছোরা, ভোজালি, সরুমুখের তরোয়াল।

একবার আদেশ পেলেই ঘুমন্ত গ্রাম লাফিয়ে উঠবে।

কিন্তু পেড্রো আদেশ না দিয়ে হঠাৎ উঠে গেল একটি গাছ বেয়ে সেই বাড়ীর দোতলায়। আজও মনে আছে সে দৃশ্য পেড্রোর।

বোধহয় সেদিন কারও ফুলশয্যার রাত্রি ছিল।

নর-নারীর মিলনের মাঝে খুলে যাচ্ছে নতুন এক জীবন রহস্যের দ্বার।

পেড্রো একটি ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরেছিল কিন্তু চোখ গলিয়ে দিয়ে আর চোখ রাখতে পারেনি। তারপর কি যে তার হল, নারীর সান্নিধ্য কখনও সে পায়নি, নারী পুরুষের কি কাজে লাগে তাও তার জানা ছিল না। যা জানা ছিল তা অনুমান। হঠাৎ দারুণ রাগে নিচের দিকে তাকিয়ে দলবলকে সঙ্কেতের স্বরে আদেশ জানাল।

তারপর মার মার শব্দ। আগুন ধরল। ঘর বাড়ী জ্বালান হল। বাধাদানকারীর রক্তে হাত রাঙা হল।

সেই নব দম্পতির স্বামীটিকে পেড্রো নিজের হাতে বধ করল। বধ করার সময়ে যেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে বধ করছে এমনি আক্রোশে ফুলল। আর মেয়েটাকে বুকের মধ্যে তুলে নিয়ে, যেমন করে তার স্বামী বুকে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়েছিল তেমনি করে নৌকোর মধ্যে নিয়ে চুম্বন করল।

না, সেও পরদিন এই হুগলীর দাসবাজারে বিক্রি হয়ে গেল। রাতের স্বপ্ন দিনে আর থাকেনি।

তাছাড়া মেয়ে নিয়ে করবে কি পেড্রো? দস্যুবৃত্তি করাই যাদের পেশা, ঘর বাঁধবে কোথায়? তবু যেন এদেশের মেয়েগুলোকে কেমন যেন ইচ্ছে করে বুকের মধ্যে ধরে রাখতে। নৃশংস প্রকৃতির অত্যাচারী পেড্রোও একথা ভাবছিল। তার মত ভয়ঙ্কর, মায়া দয়াহীন, যে হাসতে হাসতে খুন করে, কথায় কথায় চাবুক চালায়, যার মত কেউ নেই এই দস্যুবণিকদের মধ্যে, সেও এই কথা ভাবছিল। হঠাৎ পেড্রো চঞ্চল হয়ে উঠল, হাতের চাবুক ঘুরিয়ে চিৎকার করে খদ্দের ডাকতে লাগল।

হট্টগোল সেই আগের মত সরব।

হঠাৎ সেই ভীড়ের মধ্যেই কাদের যেন এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদের জুতোর শব্দে ধূলো উড়ল।

বন্দুকের কালো কালো গোলাকার নলগুলি দেখে ভীড় দু'পাশে সিঁথির মত ভাগ হয়ে যেতে লাগল।

বাজারের মধ্যে এসে দাঁড়াল দুর্গাধ্যক্ষ পর্তুগীজ সেনাপতি ডি মিলো।

জন ডি মিলো।

বয়স্ক নয়, তরুণ সেনাধ্যক্ষ কিন্তু মুখের ওপর বয়স্ক মানুষের ছাপ। গম্ভীর, রাশভারী। চলার ভঙ্গিতে অধিনায়কের পদক্ষেপ।

নিলামদারের উচ্চকিত ডাক থেমে গেল। নেটিভ মহাজনরা পা পা করে সরে দাঁড়াল।

ডি মিলোর মুখে চিন্তার ছায়া। তখনও যে ক'টি যুবতী মেয়ে দড়ির গিঁটে ধরা ছিল তাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু মুখগুলো দেখে কিছু ঠিক করতে পারল না। হঠাৎ পেড্রোকে ডেকে ডি মিলো একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল—তুমি বলতে পার দিল্লীর সম্রাটের দুজন ক্রীতদাসী এখানে এসেছে? তারা এখন কোথায়?

একই জাত ভাই। একই স্বার্থকে কামাল করতে এদেশে এসেছে। কেউ দস্যুবৃত্তি নিয়ে মানুষ ধরে বেড়াচ্ছে, কেউ সৈন্য সেজে এদেশে পর্তুগালের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু দুজনের উদ্দেশ্য এক। তবুও মনের তফাৎ। স্বভাবের তফাৎ হলেও দেশের জন্যে, জাতির জন্যে একই কথা না ভেবে পারে না।

ডি মিলোর দু'পাশে সঙ্গীনধারী রক্ষী। তারা সতর্ক প্রহরায় কটমটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাত্র একটি আদেশের জন্য। তারা আদেশ পালনকারী ভৃত্য। আদেশ ছাড়া এক পাও চলতে পারে না। একটি আদেশ পেলে গুলি ছুঁড়ে বাজারের সমস্ত হট্টগোল স্তব্ধ করে দিতে পারে।

দস্যুসর্দারদেরও এই দুর্গাধ্যক্ষের আদেশ মানতে হয়। একবার কি এক কারণে ডি মিলো এই দাসবাজারে দস্যুবণিকদের ওপর হামলা চালিয়েছিল।

একজন নিহতও হয়েছিল রক্ষীর হাতে।

দস্যুবণিকরা জানে, পর্তুগীজ সরকারের সব হুকুম এই সব দুর্গাধ্যক্ষদের হাতে আছে। আইন, শৃঙ্খলা বাঁচাবার জন্যে দুর্গাধ্যক্ষদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

মূর্খ দস্যুবণিক জানে না আইন শৃঙ্খলায় কিছু। তাই তারা সরকারের প্রতিনিধিদের ভয় করে।

সঙ্গে মারাত্মক ধরণের অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তারা হাত পা গুটিয়ে থাকে।

পেড্রোর মত অন্যান্য পর্তুগীজ সর্দারের কাছেও অনেক মারণাস্ত্র ছিল।

তবু পেড্রো ডি মিলোর কথায় চিন্তিত হল। বলল—বলতে পারছি না তো ক্যাপ্টেন।

ব্যাপারটা খুবই জটিল। ডি মিলো পদমর্যাদা থেকে নেমে এসে অন্তরঙ্গ

হয়ে উঠল। খবর এখনও আমার কাছে আসেনি। তবে মুর কমাণ্ডার কাশিম খান জুয়িনীর কাছে এসেছে। আমার গুপ্তচর খবরটা তুলে এনেছে।

তারপর ডি মিলো বলল—ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে আঁচ করতে পারছ? একটু অসাবধানতায় পর্তুগালের অধিকার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

হঠাৎ ডি মিলো পদস্থ মর্যাদায় চিৎকার দিয়ে উঠল, ঠিক আছে বাজার শেষ হলে সর্দাররা আমার অফিসে চলে আসবে। একসঙ্গে বসে ব্যাপারটা কতদূর কি, আদৌ এটা সম্রাটের রাজনৈতিক চাল কিনা ভেবে দেখতে হবে।

ডি মিলো হুগলী দুর্গের সেনাধ্যক্ষ হলেও সে যেন ভারতে সকল পর্তুগীজদের মতই একজন। তাছাড়া ভারতের মাটিতে সব পর্তুগীজদের যা উদ্দেশ্য তার তো তার চেয়ে বেশী নয়। তাই সেনাপতি হয়েও কমাণ্ডিং বক্তৃতা দিল না, অন্তরঙ্গ হয়ে মিতালী চাইল। এরকম ঘটনা তো আর ঘটেনি! তাই তার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। সে আবার তার রক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকে গেল।

দাসবাজার আবার প্রাণ পেয়ে সচল হয়ে উঠল।

● ● ●

সন্ধ্যের সময়। বিলিতী নক্সাকাটা দেয়াল গিরির সামনে বসে সেনাপতি ডি মিলো। এটি একটি মিটিংকক্ষ। কক্ষটি বেশ লম্বা।

একটি জাম রঙের চকচকে লম্বা মেহগনি টেবিলের সামনে কজন লোক। সকলেই পর্তুগীজ। তার মধ্যে দস্যুবণিক পেড্রো ও স্বাধীন ব্যবসাদার দিগো রিবেলীকে দেখা যাচ্ছে।

ছায়া ছায়া অন্ধকারটা ছড়িয়ে আছে লম্বা হলঘরটায়। দেওয়ালের বিভিন্ন অংশে পর্তুগাল রাজাদের প্রতিকৃতি। ভারতে প্রথম পর্তুগীজ আগমনকারী ভাস্কো ডা গামা, রাজপ্রতিনিধি আলমিদা ও আলবুকার্কের ছবি। তাছাড়া আছে আংটায় ঝোলানো বিভিন্ন ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র। নানা ধরণের বন্দুক, হয়ত তা গুলি ভরা, নানাধরণের ছোরা, ভোজালি, রামদা। চকচক করছে আলো অন্ধকারে।

হলঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। বাইরের দরজায় প্রহরী বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। তার চলার ভারী জুতোর শব্দ নিস্তব্ধ হলঘরে ছুটে আসছে।

অনেক সৈনিক আছে এ দুর্গে। আর তারা সব সৈন্যবিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত। এসেছে পর্তুগীজদের দেশ থেকে। বাইরের অনেকেই জানে না এ সংবাদ। তবে এখানকার পর্তুগীজ অধিবাসীরা তা জানে। কেন এনে রাখা হয়েছে তাও তাদের অজানা নয়।

তবু ডি মিলো একটু গোপনতার আশ্রয় নিয়েছে। এ দেশের কোন লোককেই জানতে দেয়নি তার এই গোপন আয়োজন। তাই দুর্গ মধ্যে ঢোকার কড়াকড়ি আছে।

ব্যবসা করার অধিকার তারা পেয়েছে। আকবর, জাহাঙ্গীরের ফরমানই তার প্রমাণ কিন্তু কোন স্বাধীন রাজ্য গঠন করার অধিকার তাদের নেই।

সব হুকুম কি সবার কাছ থেকে নিতে হয়? নিতে গেলে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হয়। বিশ্বস্ততা দেখাতে গেলে এদেশে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অথচ এদেশে অধিকার প্রতিষ্ঠার বাসনাই তাদের আছে।

সেই অধিকারটাই সবার আগে দরকার। এ দেশের মানুষদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদেরই জায়গায় রাজা হয়ে বসতে হবে।

'অন্যান্য বিদেশীরাও ভারতে এসেছে। ওলন্দাজরা এসে গেছে। ডাচ ও ফরাসীরাও আসতে শুরু করেছে।

ইংলণ্ড অধিবাসীরা মাঝে-মাঝে জলে জাহাজ ভাসিয়ে এশিয়া মহাদেশের দিকে এগিয়ে আসছে, তারপর কোথায় যেন সরে পড়ছে।

সপ্তগ্রামে কোন দুর্গ তৈরী করেনি পর্তুগীজ। করেছে হুগলীতে। এখন কাচা কাঠের দুর্গ আছে, ভেতরের বাড়ীগুলি শুধু ইটের। পরে দুর্গ পাকা করার ইচ্ছে আছে।

তারপর অস্ত্রাগারে জমছে প্রায়ই নানা ধরণের অস্ত্র। জাহাজ আসে বিদেশ থেকে নানাবিধ বিদেশী পণ্য নিয়ে কিন্তু আসলে জাহাজের খোলের মধ্যে থাকে লুকানো অস্ত্র-শস্ত্র। সে অস্ত্রের কিছু পরিবেশনও করা হয় পর্তুগীজ দস্যুবণিকদের। বণিকরা স্বাধীন ব্যবসা করে বটে কিন্তু সে জানে এ দেশের লোক। আসলে দস্যুবণিকরাও দেশের স্বার্থে এই সব করে। তাদের প্রতি নির্দেশ আছে এই সব করে পর্তুগীজদের দল ভারী করতে হবে। তাই দস্যুবণিকরা এক একজন ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। এক একজন দস্যুবণিক যেন নরখাদক, হিংস্র বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

বাংলাদেশ তথা ভারতের অনেক স্থানের লোকেরা এই পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভয়ে অতিষ্ঠ। স্বাভাবিক জীবন বলে যেন কিছু নেই। নদী দিয়ে পর্তুগীজ জাহাজ ঘোরাফেরা করতে দেখলেই তারা প্রাণের আশা ছেড়ে দেয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার চাপ বেঁধে দুর্গ মধ্যে ঘন হয়ে ছিল।

সৈন্যদের বাসকক্ষ থেকে ছুটে আসছে কিছু চাপা হট্টগোল।

সে হট্টগোল আনন্দের, খুশির। কোন ভয় বা সংশয় নেই তাদের মধ্যে। এ দেশটাও তাদের হয়ে গেছে এমনি তাদের মনের গতি।

ডি মিলো চিন্তিতকণ্ঠে বলল, খবরটা আমাকে গুপ্তচর রসুল আলি দিতেই চিন্তিত হয়ে পড়েছি। খবর যদি সত্যি হয়, তাহলে বিপদটা কতদূর গড়াতে পারে আশাকরি সকলেই আন্দাজ করবে! বাংলাদেশে পর্তুগীজ অধিকার এই হুগলীতে বেশ বিস্তার লাভ করেছে, হয়ত একদিন মুরদের অধিকার বাংলাদেশ থেকে তুলে দেওয়া যেতে পারে।

রসুল আলির দিকে উপস্থিত সকলে তাকাল। রসুল আলি মুঘলদের সৈন্য-বাহিনীর লোক। বাংলাদেশের সুবেদারের বাহিনীতে থেকে এদের গুপ্তচরের কাজ

করে। বিনিময়ে নতুন এক সুযোগের শপথ পর্তুগীজেরা করেছে। অবশ্য প্রতিটি মূল্যবান খবরের জন্যে নগদ বিদায় দেওয়া হয়।

আজকের খবরটা এত চরম যে ডি মিলো তা শুনে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় দিতে পারে নি। অবশ্য এই থাকার জন্যে হয়ত সুবেদার জেনে নেবে তার আসল পরিচয়। সেই কথা ভেবেই রসুল আলি ছটফট করছিল। এক সময়ে বলল, সাহেব, আমাকে ছেড়ে দিন। জানাজানি হয়ে গেলে আমার প্রাণ যাবার সম্ভাবনা।

কেউ তার কথায় কান দিল না।

বসেছিল কয়েকজন জংলী ধরণের দস্যুসর্দার। কারো এক মুখ দাঁড়ি, তেল তেলে মুখ। চোখ দুটো ভয়ঙ্কর ভাবে জ্বলছে। কেউ মুখখানি সেই অল্প আলোয় ধরে আরও ভয়ঙ্কর করতে চাইছে। কিন্তু সবার মুখেই উদ্বেগের ছায়া।

পেড্রোও তাদের মধ্যে ছিল। সে হঠাৎ ফেডরিক বলে এক চোখ কাণা একটি লোকের দিকে তাকিয়ে বলল—এই, তুমি তো ওপথ দিয়ে জাহাজ নিয়ে আসো, সম্রাটের কোন ক্রীতদাসীদের জাহাজে তুলেছ কি না মনে করতে পারো না ?

ফেডরিক এক চোখ হারায় এই দস্যুতা করেই। তাছাড়া তার একটি বদনাম আছে, সুন্দরী যুবতী পেলেই সে একবার ভোগ করে নিয়ে তবে বাজারে দেয়। ঐ চোখটায় একটি মেয়েই অতর্কিতে ছুরি বসিয়ে চিরতরে নষ্ট করে দিয়েছে। ফেডরিক সেই আক্রোশে আজও প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে।

তার সঙ্গীরা তাকে কত নিষেধ করে। এদেশের লোককে চেনো না। এরা নারীদের মায়ের সঙ্গে তুলনা করে। তুমি কোনদিন বিপদে পড়বে।

ফেডরিক হাসে।

আজও সে তেমনি ভাবে হাসল, তারপর বলল, অতো-শতো কি মনে আছে ?

মনে কর। বিপদ সবার। সম্রাট যদি এই হেতু দেখিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমরা কিছুই করতে পারব না।

কিন্তু ফেডরিক সে কথায় কোন আমল দিল না। কানা চোখে মুখখানা আরও রসিকতার মত করে বলল, সেনাপতি যত ভয় করছেন, তত ভয়ের কিছু নেই।

নেই ? জন ডি মিলো কেমন যেন কৌতুক চোখে ফেডরিকের দিকে চাইল।

হুগলীর আর একজন কুঠিয়াল বারেটো। সে বলল, না, না ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। জাহাঙ্গীরের আমলে এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের জলপথের লোকেরা সম্রাটের একটি বহুলক্ষ টাকার পণ্যবাহী জাহাজ লুঠ করেছিল। তারা ভেবে পায়নি তার পরিণতি এত সাংঘাতিক হবে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর সুরাটের শাসককে আদেশ দিলেন, মুঘল সৈন্য দিয়ে যেন পর্তুগীজদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

অথচ এই বাদশাহ জাহাঙ্গীর আকবরের মতই পর্তুগীজদের ওপর বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি কোনদিনই পর্তুগীজদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি। কিন্তু গোল বাধাল ঐ জাহাজ লুঠ। তখন আর করবার কিছু ছিল না। অনেক অনুনয়

বিনয় করেও লোক গিয়েছিল বাদশাহের কাছে। কিন্তু বাদশাহ তখন অসন্তুষ্ট। তিনি কোন কথাই কানে নিলেন না। যুদ্ধের দামাদা বেজে উঠল। জলপথে যুদ্ধ লাগল।

সুশিক্ষিত শাহী ফৌজ, জলপথের যুদ্ধেও পর্তুগীজরা পারল না। তারপর পরাজিত অধিবাসীদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়েছিল সে ঘটনাও বেশী দিনের কথা নয়। এখন ১৬৩১ সাল, ঘটনাটা ঘটেছিল ১৩১০ সালে।

বহু পর্তুগীজ অধিবাসী তখন ভারতের চতুর্দিকে আজকের মত বসতি স্থাপন করেছে। তাদের ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হল আগ্রার রাজপ্রাসাদে। কয়েদ করা হল, অনাহারে রাখা হল বহু লোককে হাতির নিচে ফেলে দেওয়া হল। আগ্রা, লাহোরের গির্জা বন্ধ হয়ে গেল।

বারেটো বলল, তখন আমি এদেশে প্রথম একটি দক্ষিণ ভারতের মেয়ে বিয়ে করেছি। মেয়েটিকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল। আর আমাকে যেতে হল লাহোর জেলে। তারপর কর্জন জেস্থইট ফাদার গিয়ে জাহাঙ্গীরকে বোঝাল, তারপর মিটমাট হল।

বারোটা আবার বলল, তবে জাহাঙ্গীর এক ধরণের লোক ছিলেন কিন্তু পুত্র শাহজাহান সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। সে সিংহাসন পেয়েছে কতকগুলো ভাইকে হত্যা করে। একবার চিন্তা কর—সে যে কোন ওজর আপত্তি শুনবে না তা বোঝা যায়।

রসুল আলি বলল, সাহেব ঠিক বলেছেন। তাছাড়া সম্রাট, সম্রাজ্ঞী মমতাজের অনুরোধে এই আদেশ পাঠিয়েছেন। তাঁর হারেমমহল থেকে ক্রীতদাসী সরে পড়েছে বলে সম্রাজ্ঞী মমতাজ অসম্মানিত হয়েছেন।

ডি মিলো বলল, কিন্তু সেই দুজন ক্রীতদাসী পর্তুগীজরা ফুঁসলিয়ে নিয়ে গেছে, এ কথাই বা সম্রাট ভাবলেন কেমন করে?

রসুল আলি হেসে বলল. মুঘলরা আজ ভারতে রাজত্ব করছে কম দিন নয়, এ খবর তাদের যোগাড় করতে কি খুব অসুবিধে হয়?

কিন্তু এ খবর তাদের তো সত্যি নয়! আমরা তাঁর ক্রীতদাসী চুরি করিনি।

রসুল আলি উঠে দাঁড়াল, বলল, এবার আমায় বিদায় দিন সাহেব। সুবেদার কাশিম খান জুয়িনীর ফরমান দু'একদিনের মধ্যে এসে পড়বে, তখন এর জবাব দেবেন।

সকলেই তারপর উঠে পড়ল।

দস্যুবণিকরা একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। বারোটা ও দিগো রিবেলী বেরিয়ে এল। আরও কজন সম্ভ্রান্ত পর্তুগীজ বাসিন্দা এসেছিল, তারাও অন্ধকারে পথ চলতে লাগল।

দিগো রিবেলী আগেও কোন কথা বলেনি, এখনও বলল না।

বারেটো যেতে যেতে বলল, মিঃ রিবেলী, আপনি তো কোন কথা বললেন না, আপনার কি মত? আমরা কি আবার সেই সম্রাটের চক্রান্তে পড়ব?

দিগো রিবেলী তাতেও কোন কথার উত্তর দিল না। যেন কি ভাবছিল। শুধু

এক সময়ে ম্লান হেসে বলল, কি জানি, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। হয়ত পর্তুগীজরা আবার মূরদের চক্রান্তে পড়বে।

তারপর দুর্গের বাইরে এসে বারেটো একদিকে গেল, দিগো রিবেলী নিঃশব্দে নিজের বাড়ীর দিকে রওনা দিল।

পথে ব্যাণ্ডেল গির্জা পড়ল। গির্জা ঘরের ঘণ্টা বাজছে। দিগো রিবেলী একবার তার মধ্যে ঢুকল।

গির্জার মধ্যে উঁচু সিংহাসনে মেরী মাতার ছবি। উঁচু সিংহাসনটাও রাজসিক। লাল ভেলভেটে মোড়া বেদীর আসন। আসনের চার পাশে রঙীন কাপড়ের ঘেরাটোপ। বড় বড় সাইজের মোমবাতি জ্বলছে কয়েকটি। ঢোলা পোষাকে ফাদারদের অদ্ভুত লাগছে। ফাদাররা ঘোরাঘুরি করছে গির্জা প্রাঙ্গণে। সদ্য ধর্মান্তরিত এদেশের নারী, পুরুষ, শিশুরা তন্ময় হয়ে প্রিয়দর্শিনী মেরীর দিকে তাকিয়ে আছে। ফাদার কাবরল ওল্ড টেস্টামেণ্ট থেকে পড়ে শোনাচ্ছে। গম গম করছে তার স্বরে গির্জা প্রাঙ্গণ।

দিগো রিবেলী হাঁটু নামিয়ে ঈশ্বরকে উপাসনা করল।

হীরাকে আলভার কাছে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল লবণের গোলায়। সেই বেয়াড়া ক্রীতদাসকে আজ চাবুক মারতে হয়েছে। চাবুক খেয়ে লোকটা গড়িয়ে গেছে। আর উঠে দাঁড়াতে পারে নি। মুখ দিয়ে কেমন যেন রক্ত পড়তে শুরু করেছিল।

তারপর ডাক্তার স্থজা এসেছেন কিন্তু এসে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে গেছেন।

এতটা হবে সে কি আশা করেছিল? লোকটার রোখ দেখে ভেবেছিল শক্তি আছে। কিন্তু ভেতরে যে এত দুর্বল, কে জানতো?

লোকটা খৃষ্টান হলেই তাকে মুক্তি দেওয়া হত। মুক্তি পাওয়া খৃষ্টান অধিবাসীরা যেখানে আছে সেখানে চলে যেত। মিশন থেকে ভার নিত। সংসারী করে দিত। কিন্তু লোকটা কেমন যেন একরোখা। বলে, তোমাদের ধর্ম কেন নেবো? তোমরা এ দেশের শত্রু। আমাদের মারধোর কর, ঘর জ্বালিয়ে দাও, বউ ছেলে কেড়ে নাও। তোমরা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

লোকটার আগুন জ্বালা কথা শুনেই দিগো রিবেলী আর সহ্য করতে পারে নি। চাবুক চালিয়ে দিয়েছে। সমস্ত শরীর দড়ি হয়ে রক্ত ফুটে বেরিয়েছে। চাবুকের পাকানো চামড়ার শত দড়ির ছাপ যেন ছবি হয়ে জেগেছে। তারপর লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে। আর উঠে দাঁড়ায় নি।

লোকটা মরে যেতে কেমন যেন সারাদিনটা দিগো রিবেলীর খারাপ লেগেছে।

দুপুরের ডিনারটাও ভাল করে খেতে পারে নি।

আলভা শুধিয়েছে, ডিয়ার, তুমি কি অসুস্থ ?

নো ডারলিং, এমনি।

পর্তুগীজ মেয়ে আলভা। এখানেই একদিন কুমারী অবস্থায় জাহাজে এসেছিল। তারপর দিগোকে বিয়ে করে থেকে গেছে।

আলভার মমতা যেন এ দেশের মেয়ের মত। স্বামীকে শুধু ভালই বাসে, নিরবে সেবা দেয়। কোন অনুযোগ নেই। স্বামীর খুশির ওপর তার খুশি। স্বামী বিলাস জীবনকে সে নিরবে সমর্থন করে, সাহায্য করে। নিজের অধিকারের জন্য কৈফিয়ৎ চায় না।

সেকেণ্ড ওয়াইফ অফ দিগো রিবেলী। প্রথম স্ত্রী গোয়ার। মুসলমান রমণী। খাঁটি মুসলমান ধর্মকে সে পালন করে। তার কাছ থেকেই দিগো রিবেলীর মুসলমানী আদব কায়দা শেখা। তারপরের দুটি হিন্দু। একটি রাজস্থানী মেয়ে, আর একটি বাঙালী ব্রাহ্মণ কন্যা। তা ছাড়া অন্তঃপুরে আছে অনেক উপপত্নী। তাদের দেখাশুনার ভার আলভার।

দুপুরে একবার নতুন মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঐ লোকটা মরে যেতে, মনের ওপর চাপ পড়তে, কেমন যেন মনের সুরটা পালটে গেছে। তবু ডিনার টেবিলে আলভাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মেয়েটি কি করছে ?

আলভা মৃদুকণ্ঠে কেমন যেন নিজেই অপরাধীর মত মাথা নীচু করে উত্তর দিয়েছিল, সে ঘুমুচ্ছে।

দিগো রিবেলী জানে, আলভা কেন এমন করে ? সে তার অস্থির স্বামীকে নিজের কাছে ধরে রাখতে পারে না বলে লজ্জিত। দিগো রিবেলী সে দিকে মন দেয় না। ওসব দিকে মন দিলে তো ঝেঁটিয়ে অন্তঃপুর সাফ করে আলভাকে নিয়ে থাকতে হয়। না, না সে কখনও সম্ভব নয়। আলভা নিজের দেশের মেয়ে হলেও সে কেমন করে এই দেশের সুখ ছাড়বে। তা ছাড়া জীবনে উন্নতির জন্যে যে কায়িক পরিশ্রমের দরকার সে তো একদিন তা করেছে !

আজ অবসর জীবন। বাংলা দেশে পর্তুগীজদের মধ্যে সে সম্ভ্রান্ত। পর্তুগীজ রাজার কাছেও সে একজন বিশিষ্ট দেশবাসী।

দিগো রিবেলী এগিয়ে চলল নিজের বাড়ীর দিকে। তারার মালা পরেছে আকাশের চাঁদোয়া। দূরে দাসবাজারটা কেমন যেন নিঃশব্দে পড়ে আছে। দুর্গটা দূরে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। আমগাছের পাতার মধ্যে থেকে কে যেন ডেকে উঠল। দু'পাশে ঝুপিঝাপি ঘন আগাছা জঙ্গল। জোনাকি জ্বলছে মাঝে মাঝে।

দিগো রিবেলী এগিয়ে চলল ঘাসের গালিচা মাড়িয়ে।

ফাদার দা ক্রুজের সঙ্গে দেখা হল।

এই একজন ধর্মযাজক। অদ্ভুত তার মন ও চেহারা। এসেছে এদেশে যেন ধর্মপ্রচার করতে নয় ! কাউকে বলে না খৃষ্টান হতে। শুধু মাঠে মাঠে ছড়িয়ে যায়

কি যেন। বাঁ হাতে চেপে ধরা একটি সাধারণ থলি। সে সারাদিন সেই থলি থেকে কি বের করে ছড়িয়ে যায়।

অন্যান্য ফাদাররা তার ওপর খুশি নয়। তারা বলে, তুমি যীশু হত্যাকারী জুডাসের মত ধর্মের শত্রু।

তাতেও দা ক্রুজের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলে, দেখবে, আমি কি করতে চেয়েছিলাম। এমনি করেই খৃষ্টধর্ম প্রচার হবে? অত্যাচারের চেয়ে ওদেশের ফুল এদেশে ফোটালে, এদেশের লোকের মনে ওদেশের ওপর বিশ্বাস জন্মাবে। ফুলকে কে না ভালবাসে?

কিন্তু দা ক্রুজের কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

সে নিজের মনে ফুলের বীজই ছড়িয়ে যায়। আর মাঝে মাঝে ক্রীতদাসদের সবাজার থেকে মুক্তি দেয়। জোর করে কাউকে খৃষ্টান করতে চায় না। ক্রীতদাসকে ছেড়ে দিয়ে বলে, যাও তোমার যেখানে খুশি।

অদ্ভুত এই লোক দা ক্রুজ। দা ক্রুজ কি যেন ভাবতে ভাবতে পাশ কাটাল।

দিগো রিবেলী হঠাৎ কি ভেবে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, গুড ইভনিং ফাদার?

দা ক্রুজ অন্ধকারে তাকিয়ে শুধু হাসল। অন্ধকারেও হাসিটা তার সুন্দর দেখাল। কোন পর্তুগীজই আজ তাকে সম্মান করে না। তাই সোনালী সুর নাড়িয়ে বলল, গুড ইভনিং জেন্টলম্যান।

দা ক্রুজ আর দাঁড়াল না, হন হন করে এগিয়ে গেল।

দিগো রিবেলীও পথ চলতে লাগল।

অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আলো দেখা দিচ্ছে। ঘোলাটে মেঘটা ছাড়া ছাড়া হয়ে সরে যাচ্ছে।

হীরার কথা ভাবল দিগো রিবেলী। মেয়েটি যেন কেমন? আচ্ছা, ঐ সেই সম্রাটের ক্রীতদাসী নয় তো! পরণের পোষাকটা যেন কেমন? ঐ যদি হয়, তাহলে আর একজন কোথায় গেল? দুর্গাধ্যক্ষ ডি মিলো যেন বলল দুজন।

পা দুটো একটু দ্রুত চালাল দিগো রিবেলী। হীরাকে জিজ্ঞেস করতে হবে সে কথা।

কিন্তু যদি হীরা বলে, সে সম্রাটের ক্রীতদাসী ছিল, তাহলে? তাকে কি সে ডি মিলোর হাতে জমা করে দিয়ে আসবে?

দিয়ে আসাই উচিত। দেশের জন্যে, জাতির জন্যে সর্বনাশ হতে দেওয়া উচিত নয়। যদি সত্যিই সেই ক্রীতদাসী হীরা হয়, আর ভাবতে পারল না দিগো রিবেলী।

যতগুলি মেয়ে তার অন্তঃপুরে আছে হীরার মত যেন কেউ নয়। হীরা সত্যিই হীরকখণ্ডের মত।

অন্তঃপুরে ঢুকতে আলভা হাত ধরল।

কেমন যেন বিরক্তি জেগে উঠল দিগো রিবেলীর মনে। বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না, বলল—আলভা সরো!

আলভা আহত হয়ে সরে দাঁড়াল।

নতুন মেয়েটা কোথায় ?

আলভা জবাব দিল না। মাথা নিচু করে চোখের জল লুকোল।

দিগো রিবেলী আরও চটে উঠল, বলল, জবাব দিচ্ছ না কেন ? আমি নতুন মেয়েটার কথা জানতে চাইছি।

আলভা চোখের জল মুছে ধরা গলায় বলল, সে তেরো নম্বর ঘরেই আছে।

দিগো রিবেলী আর দাঁড়াল না, তেরো নম্বর ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

মদ দিগো রিবেলী সব সময়ে খেয়ে থাকে। নেশা তার কম হয়। লাল মুখটা আরও যেন লাল দেখায়। হাসিটা সর্বদাই মুখে থাকে বটে কিন্তু সেই হাসিটাই যেন যেন কেমন ? হাসির যে অনেক রকম অর্থ হতে পারে দিগো রিবেলীর হাসি দেখলে তাই মনে হয়।

সে যখন তার ব্যবসার আড়তে থাকে তখনও ঠোঁটে ঝুলে থাকে হাসির রৌদ্র ; কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সেই হাসির মধ্যে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলে। মাঝে মাঝে মেঘও গজরায়, গর্জনের সাথে চাবুক চলে।

দিগো রিবেলীর কথা মিষ্টি, পরিহাস তরল, আবার ভয়ঙ্কর দস্যুর মত মাঝে মাঝে আগুন হয়ে ওঠে।

জাহাজ ঘাটায় যখন মদ খুঁজতে যায়, তখন তার ছোট ছোট চোখগুলি দেখলে মনে হয় যেন শিশু। শিশু যেমন কিছু হারিয়ে ফেললে খোঁজার রেখা চোখে টেনে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি ভাবে দিগো রিবেলী জাহাজ ঘাটায় ঘুরে বেড়ায়। আবার দাসবাজারে মেয়ে খুঁজতে গিয়ে এক রকম। আলভার কাছে এক রকম। তবে আলভাকে মাঝে মাঝে সে ভালবাসে। কোথাও স্নেহের অভাব দেখলে সে ছুটে আসে। সে জানে, এই বস্তুটি আলভা দিতে তাকে কার্পণ্য করে না।

তবু আলভাকে সে সহ্য করতে পারে না। আলভা যেন বড় বেশি তাকে আড়াল করে রাখতে চায়। তার স্বভাব, তার চরিত্র, তার ভাল মন্দ সবই যেন আলভা জানে। আলভা নিরবে তাকে এগিয়ে দেয় তার মনের চাওয়াটিকে, তবু না। আলভা না থাকলেই বুঝি ভাল হত এমনি তার মনে হয়।

তেরো নম্বর ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দিগো রিবেলী সেই কথা ভাবছিল। ঘরে ঘরে তার নির্বাচিত মেয়েলোক। অনেককে ভোগ করেছে, অনেককে এখনও মজুত রেখেছে। সকলের পরিচর্যার ভার এই আলভার।

বাইরের কোন পুরুষের ঢোকবার অধিকার এই অন্তঃপুরে নেই। এমন কি কোন

পর্তুগীজ জাতভাই জানে না তার অন্তঃপুরে কত মেয়ে আছে। তবে দিগো রিবেলীকে দেখে এদিকের সপ্তগ্রাম ও হুগলীর অধিবাসীরা হাসে। বলে, দিল্লীর সম্রাটের পর পর্তুগীজরা ভারতে রাজত্ব পেলে অন্তত দিগো রিবেলীকে অন্তঃপুরের সম্রাট করে দিতে হবে।

দিগো রিবেলী এসব কটাক্ষ শোনে কিন্তু উত্তর দেয় না। মেহনতের দাম এ জগতে ভোগের দ্বারা তুলে নিতে হয়।

তাছাড়া পর্তুগীজরা এদেশে ভাল কি করছে? করতে এসেছে সুদূর পর্তুগাল থেকে এদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা। ব্যবসার নামে করছে দস্যুতা। গোপনে অস্ত্রশস্ত্র মজুত করে দেশের রাজার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, শুধু সুযোগের অপেক্ষা!

দিগো রিবেলী এগিয়ে চলল তেরো নম্বর ঘরের দিকে।

সারি সারি ঘর। ঘরের দরজায় দামী পর্দা ফেলা। নানা বর্ণের, নানা ধরণের। গোল গোল মোটা মোটা থাম। থামের গায়ে পর্তুগীজ শিল্পীর সুনিপুণ হাতের মীনা করা নক্সা। ছোট ছোট ঝাড়ের আলোতে অলিন্দের মধ্যে মৃদু আলোর বিচ্ছুরণ। নানা রঙের ঝাড়। সবই বিদেশ থেকে আনা। ঝাড়ের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বাতাসে দুলছে কাচ কাঠি। শব্দ হচ্ছে বিচিত্র। পর্দা ফেলা ঘরগুলোর মধ্যে থেকে থেকে হাসির শব্দ ছুটে আসছে। কেউ গান গাইছে নিজের ভাষায়। কিছু কিছু যন্ত্রসঙ্গীতের শব্দও ভেসে আসছে।

দিগো রিবেলী সঙ্গীত পছন্দ করে না। তবে মাঝে মাঝে পিয়ানো বাজিয়ে আলভা গাইলে শোনে। এখানে এদের জন্যে গান, নাচ ও বাজনার ব্যবস্থা রেখেছে। তার সংগ্রহ করা মেয়েলোকেরা সেই সব ব্যবহার করলে অখুশি হয় না।

তার সব কায়দাই মুঘল হারেমের মত। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজপ্রাসাদে কয়েকবার সে গিয়েছিল। হারেমে অবশ্য ঢুকতে পারেনি তবে বাইরে থেকে হারেমের সম্বন্ধে যা শুনেছিল, সেই শোনা থেকেই তার হারেম সৃষ্টি।

একবার বাদশাহের একটি বাঁদীর সাথে তার আলাপ হয়েছিল।

মেয়েটির কথা আজও মনে আছে দিগো রিবেলীর।

সে যদি বাদশাহের ভয়ে পালিয়ে না যেত তাহলে ফাষ্ট ওয়াইফ হত তার।

দিগো রিবেলীর বয়স তখন কম। সবে দেশ থেকে এসেছে। তরুণ মন।

সোনালী চুলের মাথা নিয়ে বিস্ময়ে ভারতবর্ষকে দেখছে।

দেখছে বাদশাহের ঐশ্বর্য।

সেই সময়ে ঐ মেয়েটির সঙ্গে দেখা।

আগ্রার পথ দিয়ে একদিন শরৎকালের বিকেলে নাচের ছন্দে আসছিল মেয়েটি বাদশাহ ফোর্ট থেকে। অদ্ভুত মেয়েটির চোখ মুখ।

দিগো রিবেলী তার পিছু না নিয়ে পারে নি। মেয়েটিও একটি সাহেবকে পিছু পিছু আসতে দেখে কোমর ভেঙে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে দিগো রিবেলী আরও মুগ্ধ।

পরণে বাঁদীর পোষাক। কিন্তু ঐ পোষাকেও মেয়েটিকে বিবির মত দেখাচ্ছিল মেয়েটি কোন লজ্জা পেল না।

শরৎকালের সন্ধ্যাপূর্ব বিকেলে চোখ ঘুরিয়ে ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে বিস্ময়ের ভান করে বলল, আমার পিছু নিয়েছ কেন সাহেব?

দিগো রিবেলীর তখন বিড়ম্বিত অবস্থা। কি করবে ভেবে না পেয়ে মুগ্ধ দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সরে বলে, ঠিক করেছি, কিন্তু মেয়েটি হঠাৎ চপল হয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। ও সাহেব কেন দাঁড়িয়েছ আমাকে দেখে? এই বলে মেয়েটি আবার বুকে ঢেউ তুলে হাসল। কেমন যেন বেকুব বানিয়ে দেবার ইচ্ছে।

দিগো রিবেলীর চলে যাওয়া উচিত কিন্তু সেই মুহূর্তে। তার চলে যেতেও ইচ্ছে করে না। বাদশাহের সৈনিক আছে, বাঁদীর জানাশুনা লোক আছে। তাছাড়া সে বিদেশী। এ দেশে এসেছে এই সব করতে নয়। তবু তরুণ মন, সামনে এই এদেশের যুবতী। যুবতীর দেহের দিকে যেন চোখ রাখা যায় না।

সেদিন এমনি ভাবেই শেষ হল তাদের দৃষ্টি বিনিময়।

মেয়েটি যাবার সময়ে হেসে হেসে বলে গেল, সাহেব, আর কোনদিন আমার পিছু নিও না।

দিগো রিবেলী পিছু নেবে না-ই ঠিক করেছিল। কিন্তু তরুণ সেই মনের মধ্যে তারপর থেকেই সেই মেয়েটির মুখটি ভাসে। দিগো রিবেলীর কাজকর্ম সব নষ্ট হয়ে যায়। মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে ছটফটানি। তবু সে নিজেকে ধরে রেখেছিল। ওদিকে আর কোনদিন যাবে না বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু মনই তাকে সোনালী চুলের ঝুঁটি ধরে সেই বিশেষ জায়গায় নিয়ে গেল।

আগ্রার দুর্গের ভেতরে যাবার সেই সমান সরল পথটা। সেদিনও সেই সন্ধ্যাপূর্ব মুহূর্ত।

মেয়েটি দূর থেকে দিগো রিবেলীকে দেখতে পেয়েছিল। এক মাথা সোনালী চুল হাওয়ায় উড়ছিল এলোমেলো ভাবে।

দুপাশে গাছপালার সারি। উঁচু নীচু পথ। ওপাশে বাদশাহ পরিবারের আত্মীয়দের কবর দেবার জন্যে খানিকটা ঘেরা জমি। সেখানে মৃতের মত এক নিস্তব্ধতা। মেয়েটি আগের দিনের মত আর ঘুরে দাঁড়িয়ে শাসন করল না। পাশ দিয়ে চলে গেল মিটি মিটি হাসতে হাসতে। সে দিনটা এমনি ভাবেই গেল।

পরের দিন দিগো রিবেলীই এগিয়ে গেল। মেয়েটি চলে যাচ্ছে দেখে সে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মেয়েটি বিস্ময়ে চোখ দুটি তুলে বলল—একি সাহেব। তুমি আমার পথ জোড়া করে দাঁড়ালে কেন?

দিগো রিবেলী কোন উত্তর দিতে পারল না। মুখের মধ্যে তখন সে তোত্‌লাচ্ছে।

মেয়েটি তখন মাথা নামিয়ে নিয়ে মিটি মিটি হাসছে।

তারপর কদিন পরে দেখা গেল, ওরা দুজন যে পথে লোক চলাচল করে না সেই পথে ঘুরছে। দুজনের চোখেই মুগ্ধতার আবেশ।

মেয়েটি আর চপল হয়ে হাসছে না। দিগো রিবেলীর পাশে চলতে চলতে হারেমের অনেক ভয়াবহ ইতিহাস বলে।

দিগো রিবেলীর ওর কাছ থেকেই হারেমের ইতিহাস শোনা।

আসমানী বলে—সাহেব, তোমার এই ইচ্ছা তুমি ত্যাগ কর। আমাদের মজবুরী জীবন। মহব্বতের নেশা আমাদের রাখতে নেই।

দিগো রিবেলী তবু আসমানীর সঙ্গ ছাড়ে না। প্রতিদিনই তার আশায় সেই পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর আসমানীর চোখে জল দেখা দেয়।

সাহেব, কেন তুমি আমাকে এমনিভাবে ক্ষতবিক্ষত করছ?

আমি তোমায় শাদী করব।

আসমানী বড বড় চোখে দিগো রিবেলীর দিকে তাকায়।

আসমানীর মনে পুলকের জোয়ার আসে কিন্তু পরক্ষণে তার মুখের ওপর বিষাদের ছায়া নামে। সাহেব, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?

না, আমি পাগল হই নি। আমি জেণ্টলম্যান। আমার ভালবাসার অধিকার আছে।

আসমানী এই দুঃসাহসী তরুণ সাহেবের সাহস দেখে কিছু বলতে পারে না। তাও মনের মধ্যে কি যেন সুর ঘোরে ফেরে। এমনি ভাবেই যদি চলত কি হত বলা যায় না।

আসমানী রোজ ছুটির পর নিজেই এসে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে, ওরা চলে যায় দুজনে নির্জন নিরালা এক লোকালয়হীন জায়গায়।

আসমানীর মনে আর সাহেবের জন্যে কোন বিস্ময় নেই। সে সাহেবকে তাদেরই দেশের মত এক নওজোয়ান মনে করেছে। দুই তরুণ মনের মধ্যে শাশ্বত সেই মিলনের খেলাই চলে।

আসমানী হয়ত পালিয়ে যাবার কথাই ভাবছে। দিগো রিবেলী ভাবছে, ঘর বেঁধে ঘরণী নিয়ে কোথায় থাকবে। এ দেশেরই সে বাসিন্দা হয়ে যাবে।

এই সময়ে একদিন আসমানীর দেখা সে পায় না। একদিন নয় পর পর অনেক দিন।

সেই সন্ধ্যাপূর্ব বিকেল যেন দিগো রিবেলীর চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই সুদূর দেশে এসে তরুণ মনের প্রথম ভালবাসা।

তবু আসমানীর আশা সে করেছিল। প্রথম প্রথম ভাবত, বোধহয় অসুখ করেছে তাই কাজে আসে না কিন্তু সে ভাবনাও একদিন চলে গেল।

দিগো রিবেলী আগ্রা দুর্গের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

সিপাই জিজ্ঞেস করে—ক্যয়া মাঙতা!

দিগো রিবেলী সেদিন যদি বাদশাহের ভয়ে চলে না আসত, তাহলে বোধ হয় তার প্রথম প্রেম এমনি ভাবে ক্ষতবিক্ষত হত না।

আসমানীর দেখা পেলে সেই হত রিবেলীর ফার্ষ্ট ওয়াইফ।

আজও মাঝে মাঝে দিগো রিবেলীর সেই আসমানীর কথা মনে পড়ে।

মনের মধ্যে জল বুদবুদের মত সেই অস্পষ্ট মুখখানি ভেসে উঠলে এই প্রৌঢ় বয়েসে একটা কথাই মনে আসে, সেই প্রথম রমণী তার জীবনে স্বপ্ন ছিল না। সত্যি ছিল? সত্যি যদি ছিল তবে আসমানী কোথায় গেল? তবে কি আসমানী বাদশাহ হারেমের সেই পঙ্কিল জীবনের মধ্যে হারিয়ে গেছে?

দিগো রিবেলী জানে না, সেদিন আসমানীর অবস্থা তাই হয়েছিল।

বাঁদীর জীবনে যে অভিশাপ, সেই অভিশাপে তার মনের মধ্যে স্বপ্নে গড়া সেই রঙিন পুতুল লালসার রঙে রাঙা হয়ে হারেমের মর্মর দেয়ালে মাথা ঠুকে মরেছিল।

দিগো রিবেলী আসমানীর জন্যে যে দুর্গের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। ও জানে না, ওরই পাশ দিয়ে একটি কফিন লোকের কাঁধে গোরস্থানে চলে গিয়েছিল। আর তারই মধ্যে বিষ খাওয়া নীলবর্ণ দেহে আসমানী অন্য এক মহব্বতের আশায় অন্য জগতে পাড়ি দিয়েছিল।

দিগো রিবেলী জানলে বোধহয় সেই মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ত। সেই পরিণতি জানে না বলেই আজও আসমানীর কথা সে ভাবে। আর বলে মেয়েরা অবিশ্বাসেরই জাত।

এ দেশে অবস্থাপন্ন পর্তুগীজ অধিবাসীরা অধিকাংশ জীবন ধারণ মুসলমান কায়দায় করত। তবে মুসলমান মেয়ের চেয়ে হিন্দু মেয়েই সচরাচর বিদেশীরা পছন্দ করত। দাসবাজারে হিন্দু মেয়ে এলে তাই চড়া দামে বিক্রি হত।

আর পর্তুগীজ দস্যুবণিকরাও লুঠে আনবার সময় হিন্দু মেয়ের ওপর ঝোঁক দেয় বেশি। গ্রাম লুঠ করবার সময় কুমারী, অল্প-বয়স্কা বধূর ওপর তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে।

যারা এই হুগলীতে বসতি স্থাপন করেছে। হুগলী কেন, সপ্তগ্রাম, বেতোড়, চট্টগ্রাম, গোয়া যেখানে পর্তুগীজ তার প্রাধান্য বিস্তার করেছে, সেখানেই তারা হিন্দু মেয়ে নিয়ে ঘর বেঁধেছে। দেশের মেয়েও এদেশে আসে, তবে তার চেয়ে এদেশের মেয়েদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পর্তুগীজরা ভালবাসে।

এ দেশের মেয়েরা শুধু ভালবাসে না, স্নেহ করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা স্বামীকে পূজা করে। এই দেখেই পর্তুগীজরা এতো ঝুঁকেছে এদেশের মেয়ের ওপর।

দিগো রিবেলীরও দুটি হিন্দু বউ আছে। একটি রাজস্থানী, তবে তার আদব কায়দা কেমন যেন। তার চেয়ে ব্রাহ্মণ কন্যাটিই মনের মত।

নাম সরমা।

হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ রামায়ণের কোন এক সাধ্বী পত্নীর নাম যেন সরমা। সে যাকৃগে। সরমা সত্যিই সাধ্বী। তার কাছে গেলে কেমন নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়। তার

সঙ্গে প্রথম দেখা হলে সে গলায় কাপড়ের বের দিয়ে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

তার ঘরে জ্বলে সারারাত্রি তেলের প্রদীপ। সে দেয়ালগিরি ঐ ধরণের কোন উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করে না। প্রদীপের আলোয় কি সুন্দর স্নিগ্ধতা। ছায়া ছায়া আলো আঁধারির মধ্যে সরমাকে দেখায় যেন হিন্দুর পুতুল প্রতিমার মত। ঠিক গড অফ ওয়ারশিপ্।

দিগো রিবেলী সময় পেলেই তার কাছে যায়। যখন কিছু ভাল লাগে না, তখন সেখানে গেলে কেমন যেন শান্তি পায়।

শুধু দিগো রিবেলী নয়, পর্তুগীজরা যেন এই বাংলা দেশে আসল সম্পদের খোঁজ পেয়েছে।

আম সুপারি, কাঁঠাল গাছের দেশ। সবুজ স্নিগ্ধ বনানীর মাঝে, পাখী ডাকা দিনে, জ্যোৎস্না ভরা রাত্রে শুধু বিস্ময়ের চোখে দুটি কাজল কালো চোখের মেদুর দৃষ্টি মনের মধ্যে খেলা করে। এ সম্পদ ভারতের কোথাও নেই। এমনটি কাদের মধ্যে আছে ?

দিগো রিবেলী চলতে চলতে একবার থমকে দাঁড়াল। ভাবল মনটা আজ ভাল নেই, যাবে কি সেই সরমার কাছে ? হয়ত সে এখন তুলসীমঞ্চের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সাড়া পেলে চমকে উঠবে। কিন্তু তারপরই মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে এমন সুন্দর হাসিটি পরিবেশন করবে যা দেখলে সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। মনের আর কোন জড়তা থাকে না।

দিগো রিবেলীর পা দু'টি সেই দিকে যেতে চাইল কিন্তু কি ভেবে সে পা টেনে নিল।

তেরো নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। পর্দা সরাল।

আলোকিত ঘরের মধ্যে হীরা নতুন পোষাক পরে আড় হয়ে শুয়েছিল। সাহেবকে দেখে সে উঠে বসল। হাসল সুন্দর করে। চোখ দিয়ে দৃষ্টি হানল।

দিগো রিবেলী মনে মনে বাহবা দিল কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়ল ডি মিলোর কথা। দেশের ও জাতির সর্বনাশ রক্ষা করতে গেলে সবার সাহায্য দরকার। সে কথা মনে পড়তে দিগো রিবেলী হীরার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার সেই ছাড়া পোষাকটা কোথায় ?

হীরা তাড়াতাড়ি পালঙ্ক থেকে নেমে এল। মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে দিগো রিবেলীর হাত ধরতে গেল।

কিন্তু রিবেলী হাত ধরতে দিল না ! বলল, আমার কথার জবাব দাও।

হীরার মুখে আরও বিস্ময় ফুটল, বলল—সে পোষাক কোথায় আছে আমি কি জানি ? আমি তো এখন তোমার দেওয়া পোষাক পরেছি।

না, সেই পোষাকটা আমার দরকার। সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে এমনভাবে কথা

বলতে রিবেলীর কষ্ট হচ্ছিল। যাকে এখনও স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। দাসবাজা.. খেকে মনে লাগা জিনিস কিনেছিল কি এই জন্যে? কিন্তু ঐ ডি মিলো যা বলল, আর এই মেয়ে যদি সত্যিই সেই সম্রাটের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ হয়? দিগো রিবেলী আর ভাবতে পারল না।

যুবতী নারী অনেক ভোগ করেছে। কিন্তু এই হীরা যেন হীরক রত্নের মত দ্যুতিময়। দেহের মধ্যে উত্তাপ শিরার রক্তের মধ্যে মিশে কেন যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে।

হীরা পরেছে সুন্দর পোষাক। শাড়ী পরেছে একটি। জরি বসানো গাঢ় নীল রঙের। প্রসাধন চর্চিত মুখ। অপরূপ স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যের ঔজ্জল্যে শরীরের রমণীয় বাঁকগুলি কেমন যেন স্পষ্ট। হীরা হঠাৎ দুলে দুলে খিল খিল করে হেসে উঠল। চপল কণ্ঠে বলল, সে পোষাক নিয়ে কি করবে সাহেব? আমি তোমার কেনা মেয়ে মানুষ! কেমন যেন কোমর বেঁকিয়ে হীরা কথাগুলি বলল।

দিগো রিবেলীর মনেও তার স্পর্শ লাগল। অন্য সময়ে হলে রমণীর এই ভঙ্গিতে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত কিন্তু তবু সে যেন কি ভাবতে লাগল। একবার ভাবল, দরকার নেই ডি মিলো যা বলেছে ভুলে গেলেই হবে। কিন্তু এদেশে পর্তুগীজদের অবস্থার কথা ভেবে আর সে ভুলতে পারল না। নিজের জাতির ওপর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে নয়, সর্বনাশ তো তার নিজেরও। সত্যিই যদি সেই ক্রীতদাসী পালিয়ে আসা এই হীরা হয়, তাহলে সম্রাট কি এই সুযোগ ছেড়ে দেবে? হঠাৎ সে প্রভুর মত গম্ভীর হয়ে সেই গম্ভীর কণ্ঠেই বলল, হীরা একটা সত্যি কথা বলবে? তুমি কি সেই সম্রাটের পালিয়ে আসা ক্রীতদাসী, যাকে খুঁজতে লোক এসেছে আমাদের কলোনীতে?

অন্য মেয়ে হলে কি করত ভাবা যায় না কিন্তু হীরা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। পুষ্ট ভারী বুকে জোয়ার তুলে বলল, ও তুমি বুঝি সাহেব সেইজন্যে আমার সেই পোষাক দেখতে চাইছিলে? তা আসল কথাটা বললেই পারতে!

দিগো রিবেলী একটু বিব্রতকণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলল, তাহলে তুমি সে নও? বল, বল তাহলে আমি একটু শান্তি পাই!

হীরা দেয়ালে পিঠের ঠেস দিয়ে মুখখানি কাত করে মুখ টিপে হেসে বলল, মোটেই না। সম্রাটের ক্রীতদাসী হবার সৌভাগ্য যদি আমার হত তাহলে কি তোমার ক্রীতদাসী হতাম সাহেব!

এমন করে হীরা কথাগুলি বলল যে অবিশ্বাস করবার মত নয়।

দিগো রিবেলী কেমন যেন খুশি হল। তবু নিঃসংশয় হবার জন্যে বলল, তোমার ঐ সুন্দর পোষাক! ও কোথায় পেলে?

হীরা আবার মুখ ভরিয়ে হাসল, তারপর বলল, ওটার একটা আলাদা ইতিহাস আছে। তবে সে কথা জিজ্ঞাসা করো না সাহেব।

দিগো রিবেলী এবার নিশ্চিন্ত হয়ে হীরার পালঙ্কের ওপর উঠে বসল।

হীরা কিন্তু সেই আগের মতই দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দুটি ঘিরে কি যেন মাদকতা ঝরে পড়ছিল।

রাত এগিয়ে চলেছে। ঘরে দিনের মত আলো। আলোয় ঘর ভাসছে। জ্যোৎস্নার মত রূপো আলো। বাইরে জ্যোৎস্না জেগেছে কিনা কেউ জানে না।

দিগো রিবেলী হীরার দিকে সহজভাবে তাকাতে পারল না।

হীরা বুঝতে পারল পুরুষের মন। সে মৃদু হাসতে লাগল।

দিগো রিবেলী একসময় মৃদুকণ্ঠে বলল, কাছে এস, দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

হীরা কাছে এল না। চোখ দুটি দিয়ে শুধু আকর্ষণের জাল ছড়াতে লাগল।

দিগো রিবেলী উঠে দাঁড়াল। আবার সে দুলে দুলে হেসে উঠল।

দিগো রিবেলী ভ্রূকুঞ্চিত করল।

আলভা আসবার সময় এক পেগ মদ দিয়েছিল। নেশাটা ঠিক জমেনি। আর একটু নেশার জন্যে সে এদিক ওদিক তাকাল।

পাশের ওপাশের আরও অন্যান্য ঘর থেকেও মেয়েলী হাসি ও তাদের ভিজে ভিজে মিষ্টি মিষ্টি কথা ছুটে আসছিল।

মেয়েটাকে কেনবার পর সে বলেছিল, তুমি বুড়ো বয়সে আমাকে নিয়ে কি করবে? সে কথা মনে পড়ল। তাইতো, সে কি সত্যিই বৃদ্ধ হয়ে আসছে! ডাকল, হীরা! জোরে ডাকতে গেল ভয় দেখাতে গেল কিন্তু নিজেই কেমন যেন দুর্বলতা অনুভব করল। চাবুকটা সঙ্গে আনলে ভাল হত। কেনা বাঁদী তার আবার অনিচ্ছা।

মেয়েটা যদি সম্রাটের সেই হারানো ক্রীতদাসী হয়, এই ভেবেই সে থমকে ছিল। না'হলে দিগো রিবেলী কি মেয়ে কিনেছে তাকে আসবাবের মত সাজিয়ে রাখবে বলে!

রিবেলী পালঙ্কে ফিরে গিয়েছিল আবার নেমে পড়ল। লাল মুখটা জ্বলতে লাগল আরও লাল হয়ে। নেশায় জড়ানো সহজ চোখ দুটো আবার যেন অন্য এক নেশায় হারাতে লাগল।

হীরা বুঝতে পারল সাহেবের মতলব।

এতক্ষণ সাপের ঝাঁপি খুলে যে মারাত্মক খেলা খেলেছিল, এবার যেন ঝাঁপিটা বন্ধ করতে চাইল। নিজের লোভাতুর ভরন্ত দেহটাকে কাপড় দিয়ে ঢাকা দিল। চোখের নেশা নেশা দুষ্টু দৃষ্টিটা পাল্টে কেমন যেন উদ্বেগে ভরে উঠল।

হঠাৎ হীরার মনে পড়ল। বলেছিল, সাহেব তুমি আমায় খৃষ্টান করলে আমি তোমার। সেই কথাই সে বললো।

রিবেলীর চোখ জ্বলছিল ক্ষুধিত শ্বাপদের মত। পর্তুগালের নীল রক্ত যেন শরীরের মধ্যে লাফাচ্ছিল। রক্তের স্রোতে দারুণ একটা দানবীয় শক্তি। শরীরের মধ্যে থেকে আদিম ক্ষুধাটা যেন প্রচণ্ডভাবে জেগে উঠেছে। কিন্তু হীরার কথা শুনে তার সেই স্বভাবগত হাসি আবার মুখের ওপর ফুটে উঠল। বলল, খৃষ্টান হবে? কথাটা যেন ব্যঙ্গের মত ঝলকাল।

হ্যাঁ, তোমাদের ধর্মটা আমার ভাল লাগে। বেশ গীর্জায় গিয়ে উপাসনা করব।

একথা শুনে দিগো রিবেলী বিস্মিত হল। দাসবাজারের মাঠেও প্রথম শুনেছিল। আবার। এ বলে কি? খৃষ্টান করার জন্যে ফাদাররা গ্রামে গ্রামে ঘুরছে। কত মেহনত করে তাদের খৃষ্টান করতে হয়। সহজে কেউ ধর্ম ছাড়তে রাজী নয়। সহজভাবে খৃষ্টান না হতে এই জুলুমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গ্রামে গ্রামে ঘুরছে পর্তুগীজ বণিকরা! ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে মেরে ধরে লোক নিয়ে আসছে। আর এ নিজেই খৃষ্টান হতে চায়?

তবু সে হেসে বলল, তুমি যখন আমার সম্পত্তি, আমার ঘরে যখন থাকবে, সে তো আমারই ধর্মপালন করবে। নতুন করে আর খৃষ্টান হয়ে করবে কি?

হীরা কেমন যেন ছোট মেয়ের মত ঠোঁট ফোলালো, না সাহেব, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চার্চে যেতে হবে। আমি বলে কত্তো কষ্ট করে তোমাদের এক দস্যুসর্দারের জাহাজে উঠে পড়েছিলাম। ক্রীতদাসী থাকার চেয়ে এ বেশ ভাল, ধর্মত্যাগ করেও তো মুক্তি, মুক্তি পেলে আমি আর কিছু চাই না।

দিগো রিবেলী সমস্যায় পড়ল, তারপর বলল, তোমাকে কিনেছি বটে তবে তুমি মুক্ত। আমার অন্তঃপুরে স্বাধীন ভাবেই থাকবে। তোমাকে কেউ কোনদিন ক্রীতদাসী বলবে না।

হঠাৎ হীরা আবার হেসে উঠল। চোখের দৃষ্টিতে রাতের কামনা মাখিয়ে বলল, আর যদি আমি পালিয়ে যাই সাহেব, তখনও কি তুমি স্বাধীনা বলে আমার পিছু পিছু যাবে না!

দিগো রিবেলী মহা সমস্যায় পড়ল। মেয়েটা তাকে বার বার কথার জালে হারিয়ে দিচ্ছে। এতো মহা ঝামেলা হল! বেশী সুযোগ পেলে মাথায় উঠতে চায়। হঠাৎ তার মনে হল, অন্যান্য মেয়েদের মত জোর করে নিজের প্রাপ্য ছিনিয়ে নিলে হয়। কিন্তু কি ভেবে তাও সে করল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আর হীরা বঙ্কিম ভঙ্গি করে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

রাত এগিয়ে চলল। ঘরে ঘরে হয়ত ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে অন্যান্য মেয়েরা। এখন কারো কাছে গেলে তাকে বিরক্ত করা হবে। হয়ত সকলেই শুনেছে, সাহেব আজ নতুন জহর কিনে এনেছে। না শুনলে সবারই আশা থাকত, তার ঘরে নিশ্চয় সাহেব উঁকি মারবে।

তাই যায় দিগো রিবেলী। প্রত্যহ রাতটা সারাদিনের পরিশ্রমের পর কারো ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর সেখানে কিছুক্ষণ একটি নরম কোমল শরীরকে লোফালুফি করে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। আর মাঝে মাঝে যায় সরমার কাছে। সরমার কাছে গেলে তার মনের উন্মাদনা কমে না। তবু কিসের যেন তৃপ্তি মেলে। হীরার কাছ থেকে ছুটে গিয়ে তার কাছেই যেতে মন চাইল। কিন্তু কেমন যেন শরীরের উত্তাপটা দেহের শিরায় মধ্যে খেলা করে মাথার মধ্যে জমছিল। আর মনে হচ্ছিল, সে কি এই মেয়েটাকে দাসবাজার থেকে কিনেছে শুধু খেলার সামগ্রী করতে?

তার শরীরে পর্তুগীজ রক্ত। তারা এদেশে এসেছে লুটতে। এদেশে পর্তুগালের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। আর এ দেশের আসল সম্পদ, গাছগাছালি ঘেরা সবুজ গ্রামের মাঝে স্নিগ্ধ সব যৌবনবতী নারী, তাদের লুটে নিয়ে ভোগ করতে। তাহলে এই মেয়েটার কথা দাঁড়িয়ে শুনছে কেন? তাকে সুযোগ দিচ্ছে কেন তাতাবার? হঠাৎ দিগো রিবেলী লাফিয়ে উঠল। ঝাঁপিয়ে পড়ল হীরার ওপর।

হীরা বোধ হয় আগেই বুঝতে পেরেছিল তাই সে সরে দাঁড়াল। হঠাৎ কাপড়ের ভেতর থেকে, এখান থেকেই সংগ্রহ করা একটি ছোট্ট বাঁকানো ছুরি বের করে বলল, হীরার ওপর জোর করলে হীরা কখনও সুযোগ দেবে না। সাহেব তুমি আমার কথা শোন, তাহলে আমিও তোমার।

দিগো রিবেলীর লাল মুখটা আরও যেন অপমানে লাল হয়ে উঠল। নেশা অনেকক্ষণ ছুটে গিয়েছিল। সে ভ্রূকুটি করে থমকে দাঁড়াল। মনে পড়ল সকালের লোকটার কথা। চাবুকটা সঙ্গে আনলেই ভাল হত। কিন্তু এমন মেয়ের পরিচয় তো কখনও সে পায় নি। দেখে তো মনে হয় এ বাংলা দেশেয় মেয়ে। বাংলা দেশের মেয়ের স্বভাবও তার জানা। প্রথমে একটু বেয়াড়া হয়। তারপর জোর করলে লুটিয়ে পড়ে। এমনি কত মেয়ে তো তার অন্তঃপুরে আছে। কমলমণি, মাধবী, লায়লা আরও আরও যেন কি কি নাম।

তার মধ্যে সুরবালা বলে একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে। বেয়াড়া প্রথম প্রথম সব মেয়েই হয়। কে চায় একজন অন্য কোন পুরুষের ঘর করতে, তার ওপর এই এক পরিবেশে এক সাথে থাকা। তাই প্রথমে বেঁকে বসে। আলভা যেন তাদের কি বোঝায়। দু চারদিন এমনি যাবে। তারপর একদিন দিগো রিবেলী জোর করলেই সব জোর ফস্‌কে যাবে কিন্তু সুরবালা সেরকম ভাবে কোন সাড়া দেয় নি। তার জন্যে একটু মেহনত করতে হয়েছিল।

দু চারদিন আলভাও তাকে বুঝিয়েছিল, স্বামীকে ধৈর্য ধরতে বলেছিল। তারপর সেও একদিন ধরা দিয়েছে।

তাই দিগো রিবেলী সকলকেই জানে কিন্তু হীরার ব্যাপার দেখে সে বুঝতে পারে না।

হীরা তখনও ধারাল ছুরির ফলাটা আলোয় মেলে ধরেছে।

দিগো রিবেলী হাসতে লাগল। ব্যাপারটাকে সহজ করে নিতে চাইল।

কিন্তু হীরা চোখ পাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আর একপাও যদি এগোও, তাহলে ছুরি চালানোর কসরৎ আমার জানা আছে সাহেব।

দিগো রিবেলী কেমন যেন ভয় পেল। পর্দার বাইরে তাকাতে গেল। অন্তঃপুরের কোথাও কোন শব্দ আছে কিনা কান পেতে শুনতে চাইল। আলভা অনেক সময় নতুন মেয়ে আনলে ঘরের বাইরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, আজও আছে কিনা জানতে চাইল দিগো রিবেলী। আলভা যদি একবার পিস্তলটা এনে দেয়! কিম্বা সঙ্গে পিস্তলটা নিয়ে এলেই পারত; কতদিন আলভা বলেছে ডারলিং, কিছু একটা

সঙ্গে রেখো, এদেশে আমরা অনেক ঝুঁকি নিয়ে থাকি। এদেশের লোক যে আমাদের ভাল চোখে দেখে না এ কথা কি জান না ?

আজ আলভার কথাই ঠিক। এই মেয়েটা সত্যিই অদ্ভুত রূপসী এবং এমনটি কখনও পাওয়া যায়নি। দাসবাজারের ঐ গাদা-গাদা মেয়ের মধ্যে থেকে বেছে যা এনেছে তার তুলনা হয় না। আগেও এমনি অনেক বেছেচে কিন্তু আজকেরটি যেন অভিনব। কিন্তু মেয়েটি এমন করছে কেন ? রূপের দিক দিয়ে রাজা বাদশার সম্পদ, মনের দিক দিয়ে এমন ভয়ঙ্কর কেন ? হঠাৎ রিবেলী বলল, হীরা, তোমার ছোরা নামাও, তুমি আসলে কি চাও বলো ? আমাকে কি তোমার পছন্দ নয় ?

হীরা হঠাৎ কেমন যেন রূঢ়কণ্ঠে বলল, আজ তুমি সাহেব আমার ঘর থেকে যাও। দিনের বেলায় এ কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো, উত্তর দেব।

রিবেলীর তবু যেন যেতে ইচ্ছে করল না। হীরার ভরা শরীর, রমণীয় শরীরের ঐশ্বর্য, উত্তেজনায় বুকের ঐ অংশ যেন সমুদ্রের ঢেউ নিয়ে ফুলছে। পর্তুগীজ সাহেব দিগো রিবেলী রাতটাকে বৃথা হতে দিতে চাইল না। বলল, হীরা, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ কিন্তু এর পরিণাম কি জান ?

হঠাৎ হীরা খিল খিল করে হেসে উঠল, হাসির দমকে দুলতে লাগল তার শরীর। ঘরটা যেন সেই হাসির ঢেউয়ে চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। তারপর হাসতে হাসতেই বলল, আমায় ভয় দেখাচ্ছ সাহেব ! এদেশের মেয়েকে তুমি তাহলে চেন না। তারা যেমন মরতেও পারে মারতেও পারে।

দিগো রিবেলীর ইচ্ছে করল না ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। বড় আশা করে এসেছিল। আজ একটি খাসা সংগ্রহ হয়েছে। মাঝে ডি মিলোর জন্যে মনটা অন্যমনস্ক হয়েছিল। তারপর সে সংশয় যেতে দেহের শিরার মধ্যে আদিম উত্তাপ জেগে উঠেছে। হোক্ সে বৃদ্ধ হয়ে আসছে। তবু কি সে অকর্মন্য ? এখনও তো তার অন্তঃপুরের মেয়েরা যন্ত্রণায় ছটফট করে।

হীরার ঘর থেকে বেরিয়ে এল নিস্ফল এক কামনা নিয়ে। বেরিয়ে না আসার উপায়ও ছিল না। বেরিয়ে আসতে তার মন চাইল না। কয়েকবার জুল জুল চোখে তাকিয়ে তারপর পা টেনে টেনে ঘরের বার হ'ল। তবে মনে মনে শপথ করল, আজ যাচ্ছি কাল আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। মনে মনে হাসলই সে।

মেয়েদের সম্ভ্রম, ও আর কতক্ষণ তারা আড়াল করে রাখতে পারে ! কত মেয়েই তো তার অন্তঃপুরে আছে কেউ কি পারল ? রিবেলীর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি খেলে গেল।

তবু হীরার ব্যবহারটা তার ভাল লাগল না। এতটা সে আশা করেনি। হীরার ঘরের পর্দা সরাতেই বাইরের দেয়ালে ঠেসান দিয়ে আলভাকে দেখতে পেল দিগো রিবেলী। যত রাগ গিয়ে পড়ল তার ওপর। গর্জে উঠল, এখানে কি করছ ?

আলভা উত্তর দিতে পারল না, মাথা নত করল।

কিন্তু দিগো রিবেলী কি ভেবে তার হাতটা চেপে ধরল, বলল, এসো ঘরে যাই।

আলভা মৃদু আলোয় স্বামীর মুখ দেখবার চেষ্টা করল কিন্তু লম্বা স্বামীর মুখের নাগাল পেল না।

দিগো রিবেলী আলভার হাত ধরে এগিয়ে গেল। এক সময় বলল, তুমি যখন সব শুনেছ তখন পিস্তলটা আমাকে দিয়ে আসতে পারলে না!

আলভা এবারও কথা বলল না, তারপর বাঁ হাতের মুঠিতে চেপে ধরা পিস্তলটা নিঃশব্দে স্বামীর হাতে তুলে দিল।

রিবেলী হাতে নিয়ে বিস্মিত হয়ে বলল, এনেছিলে, তবে দিলে না কেন? এক আধটা মার্ডার তো আমাদের এই কলোনীতে নতুন নয়!

আলভা তবুও কোন কথা বলল না। সে কেন পিস্তলটা এনেছিল সে যদি স্বামীকে বলতে পারত?

দিগো রিবেলী সে রাত্রে আলভার শয়ন ঘরে গিয়েই ঢুকল।

আলভা তার হারানো প্রত্যাশাকে আবার ক্ষণিকের জন্যে ফিরে পেয়ে মনের বিরাট অভাবকে একদিনের জন্যে সরিয়ে দিল।

পর্তুগীজ উপনিবেশ হুগলীতে দিনের আলো ফুটে উঠল। দাসবাজার জাগল। সেই খোলা ময়দানে লোক আসতে লাগল। ভাগীরথী উত্তাল হল। পণ্য বোঝাই নৌকা, বজরা, পানসি সারা রাত্রি উজান ঠেলে হুগলী বন্দরে এসে দাঁড়ায়।

দুর্গের মাথার ওপর পর্তুগালের রাজার নিশান। সূর্যের আলো ফুটছে।

ব্যাণ্ডেলের গির্জার প্রাঙ্গণ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে ধর্মযাজকের দল। তাদের বিশ্রাম মেলে কম। সারাদিনই তাদের কাজ করতে হয়। লক্ষ্য খৃষ্টধর্ম প্রচার করা। মানুষকে অন্য ধর্ম থেকে নিয়ে এসে খৃষ্টধর্মের সারমর্ম বোঝানো। অনেক বোঝানোর পর হয়ত কেউ কেউ স্বইচ্ছায় খৃষ্টান হতে এগিয়ে আসে কিন্তু সে এত নগণ্য যে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

তাই পর্তুগীজ দস্যুবণিকরা অন্যপন্থা নিয়েছে। মানুষকে জুলুম করতে হবে, ফাঁদে ফেলতে হবে, তারপর ভীষণ অত্যাচারের মধ্যে তারা বাধ্য হয়ে ধর্মান্তরিত হবে। তা তাদের কথা ফলেছে। দাস ব্যবসা প্রবর্তন করে এখন মানুষ বাঁচবার জন্যে স্বইচ্ছায় খৃষ্টান হয়ে মুক্তি চায়। দাস প্রথা ভারতের সর্বত্র ছিল। মানুষ কিনে তাদের বিক্রি করা এ নতুন নয়। মুঘল রাজপুরীতে বহু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী আছে।

তবু পর্তুগীজ দস্যুদের এই চরম পন্থা স্বাভাবিক মানুষের জীবনকে বিপন্ন করার চেষ্টা, এ যেন মনুষ্য সমাজের চরমতম জঘন্য নিদর্শন।

পর্তুগীজ এদেশের ব্যবসা করতেই এসেছিল। প্রাচ্য দেশগুলির সাথে ব্যবসা করার ফন্দিই তাদের ছিল।

ভাস্কো-দা-গামা যখন এ দেশে আসে। তখন সে অনেক প্রতিকূল অবস্থার ভেতর

দিয়ে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল পার হয়। তারপর উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে কালিকট বন্দরে আসে। এইসময় থেকেই য়ুরোপের খৃষ্টানদের সঙ্গে ভারতের প্রত্যক্ষ বাণিজ্য শুরু।

১৪৪৩ সালে কন্‌স্টান্টিনোপল তুর্কীদের হাতে পড়ার পর স্থলপথে প্রাচ্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনা করা খৃষ্টানদের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। তারপর দ্বাদশ শতাব্দীতে লাগে মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ।

এই যুদ্ধের পরে খৃষ্টানদের পক্ষে ঐশ্বর্যশালী ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক সমুদ্র পথ ছাড়া আর সম্ভব হয় না।

এইজন্যে পর্তুগাল তার নাবিক ও দুঃসাহসী দলকে বার বার ভারত মহাসাগর দিয়ে পাঠাতে থাকে।

ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের হুকুমনামা নিয়ে পর্তুগাল ভারত মহাসাগরকে তাদের নিজস্ব এলাকা বলে ঠিক করে। প্রাচ্য দেশ যাত্রার জলপথ আবিষ্কার তাই পর্তুগালের প্রাপ্য।

ভাস্কো-দা-গামা কালিকটে এসে হিন্দুরাজা জামোরিণের অভ্যর্থনা পেয়েছিল। কিন্তু মালাবারের বণিকদের মনোভাব তার প্রতি প্রসন্ন ছিল না।

আরও কয়েক বছর পরে পর্তুগীজদের দ্বিতীয় ব্যক্তি পেড্রো আলভারেজ ক্যাব্রলি যখন এল, তখন কালিকটে হিন্দুরাজা জামোরিণ ও মুসলিম বণিকদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা লক্ষ্য করল। তারা স্পষ্টই বলল, গো ব্যাক খৃষ্টান ফরেনার।

কিন্তু পেড্রো আলভারেজ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। জামোরিণের প্রতিদ্বন্দ্বী কোচিনের হিন্দু রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করল। কোচিন ও ক্যানানূরে আশ্রয় পেল। কোচিনের বন্দর খুব ভাল হওয়ায় পর্তুগীজদের সুবিধা হল। তারা পরে এই বুঝল, এদেশের রাজাদের পরস্পরের ওপর দারুণ বিদ্বেষ আছে। সেটা কাজে লাগাতে পারলে সুবিধে হবে।

ভাস্কো-দা-গামা আবার যখন এল, তখন জামোরিণকে দলে টানার চেষ্টা করল কিন্তু না পেরে জব্দ করার ফন্দি খুঁজতে লাগল। তাতেও অপারগ হয়ে চরম যে নৃশংসতা, মানুষের ওপর কতখানি নিষ্ঠুর হওয়া যায় পর্তুগীজরা তা দেখাল। সেই নিষ্ঠুরতা তাদের আজও চলেছে। পর্তুগীজদের দেখলে তাই মানুষ ভয়ে কাঁপে। যেন সাক্ষাৎ তারা অভিশাপ।

তারপর এল রাজপ্রতিনিধি আল্‌মিদা পরে আলবুকার্ক।

আলবুকার্কই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তার লক্ষ্য ছিল আরও একটু অভিনব। ব্যবসার জন্যে কয়েকটা জায়গা দখল করে সেখানে প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা করা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মিতালী করে তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা এবং ধীরে ধীরে নিজেদের উপনিবেশ গড়ে তোলা, যেখানে তা সম্ভব নয়, দুর্গ নির্মাণ করে স্থানীয় রাজাদের কাছ থেকে কর আদায় করা।

আলবুকার্কের নীতি পর্তুগীজদের পছন্দ হয়েছিল। বহু পর্তুগীজ তাই এদেশে এসে এদেশের মেয়ে বিয়ে করে জায়গায় জায়গায় ঢুকে গেছে।

আবার প্রয়োজনে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অত্যাচার করতেও দ্বিধা করে নি। আগে পর্তুগীজদের আচার ব্যবহার কেমন ছিল জানা যায় না। তবে পরে তারা দুটি নীতিই পালন করত, এ দেশের মানুষদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করা ও দ্বিতীয় তাদের মেয়ে বিয়ে করে এ দেশের রক্তের মধ্যে মিশে যাওয়া।

আর ধর্মান্তরিত করার মতলব, খৃষ্টান হলে আর খৃষ্টানদের ওপর শত্রুতা করবে না। দলে ভিড়ে যাবে। তবু খৃষ্টান করতে গিয়েও ধর্মযাজকরা পেরে উঠত না। তারপর দস্যুতা করে বোম্বেটে নাম নিয়ে মানুষ বেচাকেনা করতে লাগল। একদিকে তাদের লাভের ঘরে কড়ি জমা হতে লাগল। অন্যদিকে ধর্মের উপকারে হাজার হাজার খৃষ্টান করার সহজ পন্থা জুটে গেল।

সেইজন্যে দুঃসাহসী হার্মাদ দস্যুদল তাদের দেশের চোখে এক একজন কৃতীপুরুষ। ফাদারদের তারা বলে, তোমরা যতই গ্রামে গ্রামে ঘুরে ধর্মপ্রচার কর, গরীবমানুষকে সাহায্যের লোভ দেখাও, আমাদের পন্থা সম্পূর্ণ অভিনব। কত ধর্মান্তরিত খৃষ্টান এদেশে তৈরী হচ্ছে গুণে দেখো!

আলবুর্কাকের নীতি অনুসরণ করে পর্তুগীজদের অধিকারে বহু জায়গায় উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে বাংলা দেশে প্রথম এই সপ্তগ্রামে।

সপ্তগ্রামের কথা বলতে গেলে বলতে হয় হুগলী বন্দর সৃষ্টি হবার আগে এই সপ্তগ্রাম একটি সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল। হুগলীর আগে সপ্তগ্রাম ছিল গাঙ্গেস রিজিয়া। ভাগীরথীর কূলে যতগুলি সমৃদ্ধিশালী নগর ও বন্দর আছে তার মধ্যে এ অন্যতম। সোনার গাঁ যেন এই সপ্তগ্রাম। হুগলীর মতই বন্দরে ভিড়ত অসংখ্য পণ্যবাহী জাহাজ। কেনাবেচা চলত সারাদিন। জলপথ স্থলপথে মানুষ আসত অন্ন সংস্থানের জন্যে।

সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামকে নিয়ে বহু কিম্বদন্তী আছে। লোকে বলে, এ অঞ্চল বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও উন্নত। হর্ষবর্ধনের বংশের কুটুম্ব ও আত্মীয়-স্বজনরা এখানে বাস করত। তা ছাড়া সাতটি গ্রাম সাতটি সাধুর নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল বলে এর নাম সপ্তগ্রাম হয়েছে। পরে সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে পর্তুগীজরা ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পৌছোয়। এখানেই তারা তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে।

তারপর তারাই সপ্তগ্রামকে একদিন কানা করে দিয়ে হুগলীতে এসে দুর্গ বানায়। সপ্তগ্রামের বন্দর আজও আছে। সেখানেও হাট বসে, কেনাবেচা হয়, ঘাটে পণ্য বোঝাই নৌকাও দাঁড়ায়, তবে আগের সে রূপ নেই। সোহাগিনী বধূকে যেমন স্বামী ভুলে গেলে তার রূপও ম্লান, তেমনি আজকের সপ্তগ্রামের অবস্থা।

তবু স্থানীয় অধিবাসীরা ভুলেও হুগলীতে আসে না। হুগলীতে পুরোপুরি পর্তুগীজ উপনিবেশ। সেখানে যা অধিবাসী আছে সবই খৃষ্টান।

নদীর ধারের হুগলীকে ভাগ করলে এক ভাগে থাকে ধর্মান্তরিত খৃষ্টান, আর অন্য ভাগে থাকে পর্তুগীজরা।

সকালবেলা ধর্মযাজকরা গির্জা থেকে বেরিয়ে একদল যায় দাসবাজারে আর

অন্যদল যায় এই সব ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের বাড়ী বাড়ী। পর্তুগীজ সরকারই তাদের দিয়েছে জমি, বাড়ী ঘর তৈরীর রসদ, আর উপার্জন করবার উপায়।

কেউ কেউ এ পাশে এসে পর্তুগীজ ব্যবসাদারদের কুঠিতে চাকরী করে। তাদের গোলায় লবণ তোলে, জাহাজে তুলে দিয়ে আসে চিনির বস্তা। বিনিময়ে বেতন পায়। তবে ব্যবসাদাররা ক্রীতদাস-দাসী দিয়ে এই সব কাজ করাতে পছন্দ করে। দাসবাজার থেকে কিনে আনা নর-নারী শিশুদের দিয়ে যে কাজ করানো যায়, বেতনভোগী খৃষ্টানদের দিয়ে তা করানো যায় না। তাই তারা ক্রীতদাস দাসী কিনেই কাজ চালায়। তবে ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের কাজ দিতে হবে এই রকম একটা হুকুম নামা থাকার জন্যে বাধ্য হয়ে কিছু কিছু কাজ দেয়।

কিন্তু ধর্মান্তরিতদের কখনও জাতে উঠতে দেয় না। একপাশে বসে খানাপিনা তো দূরের কথা, উপাসনা কক্ষেও পর্যন্ত পাশাপাশি বসে না। এই নিয়ে মাঝে মাঝে কলহ লেগে যায়।

তবে প্রত্যেক পর্তুগীজই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বহন করে ঘুরে বেড়ায়। চাবুক তাদের নিত্যকালের সঙ্গী।

ধর্মযাজকরা চেষ্টা করে দু পক্ষের মাঝে একটা বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করার। কিন্তু খৃষ্টধর্মের আদি কথা শুনিয়েও পর্তুগীজদের বাধ্য করা যায় না। যদিও তারা এ দেশের মেয়ে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে।

আবার সেই এদেশের মেয়ে, সেও এক মজার কাণ্ড, তারা এখন পর্তুগীজদের পত্নী। কর্তা যদিও বা একটু নরম হয়, গিন্নী চরম। গিন্নী যে আক্রোশ প্রকাশ করে তা সীমাহীন।

সে রাত্রে অন্যান্যরা চলে যাবার পর দুর্গাধ্যক্ষ সেনাপতি ডি মিলো দস্যুবণিকদের একত্র করে তারা যাতে সম্রাটের সেই দুই পালানো ক্রীতদাসীকে খুঁজে বের করতে পারে, তার জন্যে একটি মৃদু আদেশ জারী করে। এবং পরদিন সকালে প্রত্যেক পর্তুগীজ অধিবাসীকে জানিয়ে দেয় সম্রাটের পরবর্তী হুকুম।

যদিও তখনও সুবেদারের কোন হুকুম নামা আসেনি।

তবু অনেকেই জানত বাংলাদেশে পর্তুগীজদের এই স্বাধীন উপনিবেশের ওপর সম্রাট শাহজাহান খুশি নয়।

তাঁর বহু উপদেশমূলক ও শ্লেষমিশ্রিত সাবধানবানী জানিয়ে চিঠি এসেছে। '...আপনাদের শুধু লবণ, সোরা, চিনি, মশলা, কাপড় ব্যবসা করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মানুষ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার অনুমতি দেওয়া হয়নি, বন্ধ করুন আপনাদের দাস ব্যবসা।'

মুঘল সম্রাটের এই চিঠিকে পর্তুগীজরা অবজ্ঞা করেছে। বরং আরও পূর্ণোদ্যমে দাস বাজারের ব্যবসাকে চালিয়ে আসছে।

বাদশাহ শাহজাহান খৃষ্টান ধর্মযাজকদের কাছেও চিঠি দিয়েছেন। 'আপনারা খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক। প্রত্যেক ধর্মই পরধর্মাবলম্বীদের কাছে শ্রদ্ধার মত। আপনারাও শ্রদ্ধেয় কিন্তু আমার দেশের মানুষদের আপনারা জোর করে আপনাদের ধর্ম চাপিয়ে দিতে পারেন না, সে আদেশ আপনাদের আমি দিইনি। আপনারা শুধু নিজেদের ধর্মজীবন যাপন ও উপাসনাগৃহ নির্মাণের অধিকার পেয়েছেন।'

ব্যাণ্ডেল গীর্জার ধর্মযাজকেরা চিঠির উত্তর দিল: 'সম্রাট অহেতুক আমাদের ওপর দোষারোপ করছেন। আপনার পিতামহ ও পিতৃদেবের ফরমান অনুযায়ী আমরা কাজ করছি। এ দেশের মানুষকে খৃষ্টান করবার অধিকার আমাদের আছে। দরিদ্র এই দেশের মানুষেরা ধর্মান্তরিত হলে মনুষ্য সমাজের কল্যাণ হবে বলে তাই মনে করি। আমাদের ধর্মে আছে মানুষের কল্যাণের জন্যে আত্মনিয়োগ করাই উচিত। সকল ধর্মেরই সার কথা মানুষের সেবা।'

এরপর বাদশাহ শাহজাহানের অনুরোধ জানিয়ে পত্র এল। '...মানুষের সেবা করতে গিয়ে জোর করে ধর্মান্তরিত করবেন না। কেউ স্বইচ্ছায় খৃষ্টান হতে চাইলে কিছু বলার নেই, তবে আপনারা যে কায়দায় মানুষ দাসবাজারে নিয়ে যাচ্ছেন তারপর নিরুপায় হয়ে সেই বিপন্নরা প্রাণ বাঁচানোর জন্যে খৃষ্টান হচ্ছে। আমাদের ফরমানে কি এমন কথা লেখা আছে, যে আমাদের দেশের মানুষের নিরুপায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করবেন?'

পর্তুগীজ ধর্মযাজকরা উত্তর দিল না। তারপর একেবারে চুপ। সেই আগের নিয়মেই প্রত্যহ কাজ চলতে লাগল। দাসবাজার তেমনি পূর্ণোদ্যমে চলল। তেমনিভাবে বিপন্ন মানুষেরা খৃষ্টান হয়ে মুক্তি পেতে লাগল।

তারপর অনেকদিন চলে গেছে, এখন এল এই নতুন উপসর্গ।

সেনাপতি জন ডি মিলোরই চিন্তা বেশি। কারণ তার অধীনে হুগলী উপনিবেশ। হুগলী উপনিবেশের কিছু হলে জবাব তাকেই দিতে হবে।

গোয়ার দিকে যে জাহাজ যাচ্ছিল গতরাত্রেই একটি চিঠি লিখে ক্যাপ্টেন ভন্‌ডির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিছু আরও সৈন্য দুর্গের মধ্যে মজুত হবে। যদি যুদ্ধ লাগে; যুদ্ধই করতে হবে। মুঘল সৈন্যের সঙ্গে পারা মুস্কিল, তবে পারলে মুঘলরা হটে গেলে পর্তুগীজ ক্ষমতা আরও বাড়বে।

এই সব ভেবেই ডি মিলো গোপনে তৈরী হতে লাগল।

মিশনের ধর্মযাজকদের ডেকে সম্রাটের নতুন চক্রান্তের কথা শুনিয়ে দিল।

তারা গিয়ে উপাসনা গৃহে বসল। উপাসনা চলতে লাগল অষ্টপ্রহর।

পর্তুগীজরা খুঁজতে লাগল সেই দুটি মেয়েকে, যাদের জন্যে তাদের আজ বিপদ।

কেউ কেউ বলল, এ সম্রাটের চাল। আসলে আমাদের বাংলাদেশে থাকতে না দেবার ফন্দি।

তবু খোঁজার বিরাম থাকল না। সকলেরই দৃষ্টি দাসবাজারের ওপর। যুবতী মেয়েদের আলাদা ডেকে দস্যুসর্দাররা জিজ্ঞেস করতে লাগল।

সেখানেও আবার এক অত্যাচার শুরু হল।

সন্দেহ হয় এমন মেয়েকে দাসবাজার থেকে তুলে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করা হল উত্তর দেয় না, অনেক মেয়ের স্বভাবই এমনি। হয়ত অল্প কথা বলা অভ্যেস।

কিন্তু পর্তুগীজ স্বার্থ!

স্বয়ং ডি মিলো সামনে দাঁড়িয়ে সৈনিককে বলল—বন্দুক তুলে ধরো, আদেশ করলেই ফায়ার করবে। নিজের হাতে উদ্ধত চাবুক।

সালোয়ার, কামিজ পরা রূপসী মেয়ে। আগুনের মত যৌবন নিয়ে দাঁড়িয়ে। সৈনিকরা হাসছে।

কিন্তু ডি মিলো হাসছে না। সে পদমর্যাদায় গম্ভীর। তা ছাড়া সামনে সমূহ বিপদ। সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারেনি।

উওম্যান, তুমি সত্যি কথা বলো, যদি সত্যিই সম্রাটের ক্রীতদাসী হও, তাহলে আমরা তোমায় সাহায্য করব। সম্রাটের কাছে ফেরৎ পাঠাব না, পরিবর্তে তোমাকে যথোপযুক্ত আশ্রয় দেব।

পরের দিনও কিছু যুবতী মেয়েদের দাসবাজার থেকে তুলে আনা হল কিন্তু কেউ স্বীকার করল না।

কিছু কিছু অত্যাচারও করা হল। সুন্দর দেহগুলি চাবুকের দ্বারা রক্তাক্ত হল, বন্দুক তুলে ফায়ার করা হবে বলে ভয় দেখানো হল, তাতেও কেউ স্বীকার করল না।

সমস্ত হুগলী উপনিবেশ সেদিন সকাল থেকে যেন কি এক আশু ধ্বংসের নেশায় ছটফট করতে লাগল।

দাস বাজার ঠিক আগের নিয়মেই চলতে লাগল। তবে অন্যান্য দিনের মত সে রকম স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

বণিক সর্দারের চাবুক ঘুরছে। দাস নরনারী যন্ত্রণায় ছটফট করছে। শকুন ঘুরপাক খাচ্ছে সূর্যের মাথার ওপর।

নিলামদার চেঁচাচ্ছে। পঞ্চাশ, একশ, দুশো···যুবতী মেয়েরা খিল খিল করে হাসছে।

ফাদাররা ঘুরছে টাকার থলি নিয়ে, তবু সবই যেন কেমন নিষ্প্রাণ।

ঠিক এই সময়ে দেখা গেল মুঘল দূত আসছে ঘোড়ায় চড়ে ধূলোর ঝড় তুলে। সে দুর্গের বিরাট দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

দরজা খুলে গেল শব্দ করে। মুঘল দূতের হাতে সুবেদার কাশিম খান জুয়িনীর পত্র।

ডি মিলো দূতের হাত থেকে পত্র নিল।

'মহামহিম মুঘল আলো শ্রদ্ধেয়া সম্রাজ্ঞী মুমতাজ মহল আপনাদের ব্যবহারে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আপনারা তাঁর দুটি যুবতী বাঁদীকে মুক্তি দেবার লোভ দেখিয়ে

হুগলীতে স্থান দিয়েছেন। এই পত্র পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে যদি তাদের ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা না করেন, তাহলে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হবেন। আর যদি সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে ফেরৎ দেন, আপনাদের ক্ষমা করা হবে।'

দূত অভিবাদন করে আবার অশ্ব পৃষ্ঠে উঠে চলে গেল।

ডি মিলো পত্রটি হাতে করে তার অফিস ঘরে দাঁড়িয়ে রইল। চিঠিটা আবার পড়ল। কয়েকবার পড়ার পর মুখস্ত হয়ে গেল। শেষের কথাটা পড়ে যেন পর্তুগীজ রক্ত তার লাফিয়ে উঠল। 'অপরাধ ক্ষমা করা হবে।'

হঠাৎ সে দেয়ালে টাঙান চাবুকটা হ্যাণ্ড থেকে খুলে নিয়ে চিঠিটার ওপর সপাং সপাং করে লাগাতে লাগল।

কাদের অপরাধ কে ক্ষমা করবে? তাদের বাঁদী হারাল, দোষ পর্তুগীজদের।

রাগে মাথা খারাপ হয়ে গেল ডি মিলোর। চিঠিটা চাবুক খেয়ে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেল। হঠাৎ খেয়াল হতে প্রকৃতস্থ হল। তারপর চিঠির টুকরোগুলি তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর ফেলে জোড়া দিতে লাগল।

তারপর আবার মন্ত্রণা সভা বসল। এল পর্তুগীজ মান্যগণ্যরা, এল গির্জা থেকে ধর্মযাজকরা। তারা সকলেই চিঠিটা পড়ল।

সবারই স্বার্থ এই চিঠির সঙ্গে জড়িত। সকলেই উদ্বিগ্ন হল। পরামর্শ সভা বসল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল।

সমাধান কিছু হল না। সকলেরই উত্তর, এ মনে হয় সম্রাটের চাল। তাদের উপনিবেশ ভেঙ্গে দেবার ফন্দি।

কি জবাব তো একটা দিতে হবে! ডি মিলো ককিয়ে উঠল।

কিন্তু কি সে জবাব? সাতদিন মাত্র সময়। তা ছাড়া বাদশাহ চেয়েছেন বাঁদী ফেরৎ। চিঠির বিরুদ্ধে চিঠি চান নি। কিন্তু সেই দুজন বাঁদীকে কোথায় পাওয়া যাবে?

হুগলীর পর্তুগীজ উপনিবেশের আকাশ থমথম করতে লাগল।

যাদের হাতের চাবুক বাতাসে ঘোরে, যারা শুধু অত্যাচার করেই আনন্দ পায়, তারাও কেমন যেন জোরে চাবুক চালাতে ভুলে গেল। দুর্গের মধ্যে বহু নরনারী। দেহের অনেক অংশ কেটে তাতে লবণ দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল। রোদ্দুরে পড়ছিল, আর চিৎকার করছিল। এমনি বহু অত্যাচারের নমুনা। ফুটন্ত গরম জল কারুর ওপর ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল।

বন্দী নরনারী ঐ দস্যুবণিকদের জাহাজেই এসেছে। তারা কোন পোষই মানে নি। ভীষণ বেয়ারা ও বেয়াদপ। তারাই শুধু এই দুর্গে স্থান পায়। প্রত্যহ এমনি জমা হয়, আর তাদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়।

খ্রীষ্টান হও, অথবা ক্রীতদাস প্রথা মেনে নাও।

কিন্তু বন্দীর আর্ত চিৎকার: কিছুতেই মানব না। তোমরা কত অত্যাচার করবে দেখব? তোমরা কি মানুষ?

সেই অত্যাচারও কেমন যেন লঘু হয়ে কারাকক্ষের দেয়ালে হারিয়ে গেল।

বন্দীদের কানেও গেল সম্রাটের হুকুম। তারা ভগবানকে ডাকল।

কিন্তু ভগবানকে ডাকল না আর একদল যারা নতুন ভাবে যীশুকে পেয়েছে।

উপনিবেশের এক পাশে নতুন পল্লী। যেখানে শুধু নতুন নতুন খোড়ো চালের বাড়ি গজিয়ে উঠেছে। যেখানে হারানো সংসারের মানুষ নতুন ধর্ম পেয়ে নতুন ভাবে বাঁচতে শুরু করেছে। সেখানে শুধু নেই আনন্দ। তারা বাদশাহের নতুন হুকুম শুনে বলল, এ আবার কি আপদ ?

তাদের সবুজ মাঠে সোনালী ধান ফলেছে। মিশনারীদের কৃপায় মিলেছে বাঁচবার অধিকার। নতুন ঘরণী, নতুন ঘর। ধর্ম এসেছে সাহেবদের দেশ থেকে। এখন তারা মোটামুটি সাহেব। ইচ্ছে করলে জাহাজে উঠে য়ূরোপ পাড়ি দিতে পারে ; গির্জায় অবশ্য পর্তুগীজরা এক সারিতে বসে না। তা না বসুক। য়ূরোপে গেলে আর কোন বিভেদ থাকবে না। সবার মুখে তাই বিদেশী ভাষা। পরণের দেশী পোষাক ছেড়ে সাহেবী পোষাক পরছে। খানার সাথে গরুর মাংস। খানা গ্রহণের সময় পিয়ানোর সুরে সঙ্গীতের রিদিম। ঘরে ঘরে মেরী মাতার পুণ্যস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি। সকাল, সন্ধ্যা উপাসনার হিড়িক। ব্যাণ্ডেল গির্জায় গিয়ে সবার আগে উপাসনা। খ্রীষ্টধর্মের আসল মর্মার্থ মন দিয়ে শোনা। মন দিয়ে বুঝে হৃদয় দিয়ে পালন করা।

এরাই একদিন ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করেছিল।

তারা শুনে সম্রাটের নামে মেরীমাতার সামনে তাঁর ধ্বংস চাইল। কেউ কেউ এগিয়ে এসে ধর্মযাজকদের জানাল, দরকার হলে আমরা বাদশাহের বিরুদ্ধে লড়ব। আমাদের হয়ে আমাদের অভিমত ক্যাপ্টেন ডি মিলোকে জানাবেন।

এমনি তখন হুগলী উপনিবেশের উত্তপ্ত অবস্থা। থমথমে আকাশ।

তখন একজন লোক, ফাদর দাক্রুজ, তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়। আর থলি থেকে বীজ নিয়ে সবুজ মাঠে ছড়িয়ে যায় !

তার কথা কেউ ভাবে না, তার দিকে কেউ চায় না। অন্যান্য খ্রীষ্টান ধর্ম-যাজকরা মনে করে, সে দেশের শত্রু, খ্রীষ্টানদের শত্রু, তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত। এমন কি তাকে ব্যাণ্ডেল গির্জার বড় প্রাঙ্গণেও মাঝে মাঝে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

তার আলাদা একটি খোড়ো চালের কুঁড়েঘর আছে, আর আছে সেখানে একটি মেরীমাতার ছবি। সে নীরবে তার কাছেই কি যেন জানায়।

সোনালী নূর থুতনিতে ঝুলছে, চোখ দুটি নীল, ঢোলা আলখাল্লা পরে কোন দূরে যেন তাকিয়ে আছে।

তাকে যখন সম্রাটের নতুন আদেশ জানানো হল, সে শুধু অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। তার অভিমত জানতে চাওয়া হল কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না।

প্রশ্নকর্তা পরিহাস কণ্ঠে বলল, তুমি ফুল ফোটাবার জন্যে যে বীজ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছ, সে ফুল কি করবে ? কবরে শুয়ে দেখবে ?

স্বল্পভাষী দাক্রুজ তাতে উত্তর দেয় না। নীল চোখ মেলে কি যেন ভাবে। কোন্ সুদূরে যেন তাকিয়ে থাকে।

দিন তিনেক পরে হুগলী বন্দরে আর একটি দস্যুবণিকের জাহাজ এসে থামল। তাতেও ধূর্ত মানুষের মিছিল।

মানুষ ধরা নৌকা, বজরা, জাহাজ প্রত্যহ আসত। প্রত্যহই দাসবাজার গমগম করত। তবে মাঝে মাঝে দূর পাল্লার বিশেষ জাহাজগুলি এসে থামত কয়েকদিন অন্তর। ভারতের অনেক পথ জলপথে ঘুরে অনেক দূর দেশ থেকে মানুষ ধরে আনত।

এমনি একজন বণিক সর্দার ফেডরিক ডি ফনসিকা। যে এক চোখ হারা। যার চোখ হারানোর পিছনে কোমল হাতের দুশমনী ছিল। সে আজও সেই আক্রোশে সুন্দরী যুবতী জাহাজে তুললে একবার ভোগ না করে দাসবাজারে বিক্রী করে না। সেই ফেডরিক ডি ফনসিকা জাহাজ হুগলী বন্দরে ভিড়িয়ে কাপড়ে মোড়া একটি মৃতদেহ নিয়ে সেনাপতি ডি মিলোর কাছে চলে এল।

কাপড়ে মোড়া মৃতদেহটি একটি যুবতীর। পচা মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

বাতাস মুহূর্তে ভারী হয়ে উঠল। তবে সে কাহিনী তিনদিন পরের।

তিনদিন কাটবার আগে আরও অনেক ঘটনা সেই হুগলীর পর্তুগীজ উপনিবেশে ঘটেছিল।

পরদিন। দিগো রিবেলীর অন্তঃপুর।

সারাদিন দিগো রিবেলী সেই এদেশীয় রূপসী মেয়েটির রাত্রিকালের ব্যবহার ভোলেনি। তবে সকালবেলা হাতে কাজ অনেক। ব্যবসার অনেক রকম ফন্দি ফিকিরে সময়টা শেষ হয়ে যায়। সেদিন সকাল থেকেও তাই কাজের মধ্যে প্রবীন ব্যবসাদার ডুবে গেল।

বন্দরে গিয়ে দু'একবার দাঁড়াল। কয়েক বোতল বিলিতী পানীয় সওদা করল। কিন্তু দাসবাজারে দাঁড়াল না। খড়ের ডগা মুখে চিবুতে চিবুতে ভীড় ঠেলে ঠেলে এগোল। কিছু প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হল। শুনল তাদের কাছ থেকে সেই আগের দিনের কাহিনী কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। খড়ের ডগা চিবুতে চিবুতে সে নিজের গোলার দিকে এগোতে লাগল! সেই সাণ্ডো গেঞ্জি পরা সরু ঢ্যাঙা দেহ। নীল নীল শিরাগুলি লাল দেহ থেকে বেরিয়ে আছে। আজ সঙ্গে রেখেছে একটি পিস্তল, চওড়া চামড়ার কোমর বন্ধনী কোমরে আঁটা। ডান পাশে ঝুলছে পিস্তলের খাপ।

সূর্যের আলো পড়েছে দাসবাজারে। নারকেল গাছের মাথাগুলি দুলছে। কুঠিয়াল ডমিকার সঙ্গে দেখা হল।

সে রিবেলীর হাতে মদের বোতল দেখে রসিকতা করল, বলল, সকালবেলাই কি এগুলো শেষ করবে সর্দার?

রিবেলী সারাদিন মদ খায়। সকালবেলাও খেয়ে বেরিয়েছিল। লাল লাল চোখ তুলে শুধু ডমিকোর কথায় হাসল।

ডমিকো জাহাজ খানার দিকে চলে গেল। বলল, একবার সতিগানে যেতে হবে। কিছু চাল এসেছে সতিগান বন্দরে। সেটা আনতে যাচ্ছি। তুমি যাবে নাকি সেখানে?

রিবেলী মাথা নাড়ল। বলল, না, ওখানে আমার কোন দরকার নেই। তাছাড়া গোলায় অনেক কাজ পড়ে আছে।

ডমিকো হাসল রিবেলীর কথায়। বলল, তোমার আর কাজ কি? কাজ তো সব মাইনে করা লোকেরাই করে। তুমি শুধু দেখাশুনা কর। তারপর কাছে সরে এসে চাপাস্বরে চোখ নাচিয়ে বলল, চলো না, ওখানে গেলে তুমি লাভবান হবে। ভাল ভাল অনেক মেয়ে আছে সতিগানে। ডমিকো দাঁত মেলে অদ্ভুত ভাবে হাসতে লাগল।

কিন্তু রিবেলী হাসল না। বলল, না থাক ডমিকো, তুমি যাও। আমার অনেক কাজ আছে।

ডমিকো হাসতে হাসতেই চলে গেল।

রিবেলী ফিরল।

কাল রাত্রে আলভা যদি তাকে না নিয়ে যেত তাহলে ঠিক সে আবার চাবুকটা নিয়ে ফিরে আসত। একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়ে যেত। মেয়েটা স্ব-ইচ্ছায় কিছু না দিলে জোর করত। এমনি জোর অনেক করেছে। চারটি পত্নী ছাড়া আরও চল্লিশটি মেয়ে আছে তার অন্তঃপুরে। সবগুলি না হোক অন্তত দশটার ওপরও তাকে বলপ্রয়োগ করতে হয়েছে, কিন্তু এই মেয়েটি যে ব্যবহার করল কোনটি আর এমন করে নি।

ছুরি দেখে কি সে ভয় পেয়েছিল? ভয় ঠিক নয়, আশ্চর্য হয়েছিল। মেয়েদের এই সাহস সে কখনও দেখেনি। এমন কি তাদের দেশের মেয়ে আলভাও কোনদিন নিরাপত্তার জন্যে অস্ত্র তুলে নেয় নি।

কাল আলভা তাকে নিয়ে এল বলে মেয়েটি বেঁচে গেল। কিন্তু বাঁচবে আর কদিন?

আজ রাত্রে সে কি করবে? বহু অভ্যস্ত অভিজ্ঞ দিগো রিবেলী মনে মনে হাসল। আজ কামাল করে দেবে। আলভাকে বলে এসেছে মেয়েটিকে যেন বুঝিয়ে রাজী করায়।

আলভা সান্ত্বনা দিয়েছে, ডারলিং তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।

আলভা কাল খুব খুশি হয়েছে। মেয়েটিকে না পাওয়ায় উত্তপ্ত মন অন্য কোন উত্তাপ পেলে হয়ত শান্ত হত না, কিন্তু আলভা স্বামীকে খুশি করার প্রক্রিয়া জানে। সারারাত আলভার নেশা জাগানো শরীরে ডুবে কেমন করে যেন মিথুন রাত্রি কেটে গেছে। মনেই থাকেনি এক নারীর কাছ থেকে না পাওয়ার দুঃখ।

যা হোক, আজ আর তাকে কোন অবস্থায় মুক্তি দেওয়া হবে না। এই কথা ভেবেই দিগো রিবেলী সারাদিন ধরে নতুন এক পাওয়ার আনন্দে থেকে দিনটা কাটিয়ে দিল।

তার পরদিন বিদায় নিল। মাঝে একবার সে বাড়ী গিয়েছিল। ডিনার খেতে খেতে আলভাকে শুধিয়েছিল, সেই নটি গার্ল এখন কি করছে?

আলভা মাথা নত করে উত্তর দিয়েছিল, হয়ত সে বিশ্রাম নিচ্ছে।

আলভা যেন কেমন? অন্য মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেই মাথা নিচু করে ফেলে। এ শুধু আজ নয়, চিরকাল। অথচ এই আলভাই সমস্ত অন্তঃপুর দেখাশুনা করে। আলভা না থাকলে এই অন্তঃপুর সৃষ্টি করাও দিগো রিবেলীর পক্ষে মুশকিল হত। এক জায়গায় দুটি মেয়ে থাকলে বনিবনা হয় না তো চল্লিশটি মেয়ে! চল্লিশ জনের চল্লিশটি ঘর আছে। প্রত্যেক ঘরে তারা আলাদা থাকে। তাদের সব অভাব অভিযোগ আলভা পূরণ করে।

আলভা না থাকলে—চিন্তাই করতে পারে না দিগো রিবেলী। সে অন্তঃপুরে ঢোকে সারাদিন পরিশ্রমের পর কোন ঘরে বিশ্রাম নিতে। এ ছাড়া আর কিছুই তাকে দেখতে হয় না। দেখতে হলেই মুশকিল হত।

একবার কটি মেয়ের ঝগড়ার মাঝে পড়ে গিয়েছিল। এদেশী মেয়ে কেন, সব দেশের মেয়েরাই ঝগড়ায় পটু। স্নানের জল নিয়ে ঘটনা।

দিগো রিবেলী বাড়ীতে একটি কুয়ো কেটে দিয়েছিল, সেই কুয়োর জল তুলে পরিচারিকা বাথটবে বয়ে দিত, মেয়েরা যে যার এক এক করে স্নান করত। কোন একটি নতুন মেয়ে নদীর জলে স্নান করবে বলেছিল। তার জন্যে লোক দিয়ে নদীর জল আনানো হয়েছিল।

নতুন মানুষের সব আবদারই প্রথম প্রথম শুনতে ভাল লাগে। তখনও মনে মদির নেশাটা থাকে বলেই সব আবদার মেনে দেওয়া হয়। এ সব মেয়েদের বেলাই এক রকম। কিন্তু সেই নদীর জল নিয়ে লাগল কলহ।

পর্তুগালের মানুষ হলে কি হবে, দিগো রিবেলী এ দেশে থাকতে থাকতেই কেমন যেন এ দেশের মত হয়ে গিয়েছিল।

আলভা কিন্তু তা নয়, সে বলে, না, নিজের দেশকে ভুলবো কেন? মাদার ল্যাণ্ড অলওয়েজ আট্রাকস্ মি।

দিগো অতোটা ভাবতে পারে না। কবে দেশ থেকে চলে এসেছে। আজ মনেই পড়ে না। সুতোর মত ভাসে মনের আয়নায় কি যেন এক স্মৃতি। মনে পড়ে ছোটবেলা এদেশে তার কাটেনি। ছোটবেলায় খুব দুষ্টু ছিল। বাবা রাজপ্রাসাদে কাজ করত। বড়দিনের সময় তাদের ভাঙা বাড়ী খুব সাজানো হত। বাবা ইটের

সাইজ একটি কেক নিয়ে আসত। মা খুব ভাল গান গাইত। মার গান শুনতে কত কত লোক আসত। সে স্কুলে পড়ত তখন। তারপর আর কিছু মনে পড়ে না।

কেমন করে যেন তারপর কেউ চাকাটা ঘুরিয়ে ছিল। সব তালগোল পাকিয়ে গেল। হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল তাদের বাড়ীটা। বাপ মা কোথায় গেল আজ জানে না। যখন জ্ঞান হল, সেখান থেকে আবার তার জীবন শুরু হল, সেই জীবনের কথাই মনে পড়ে। ইণ্ডিয়ান ওশান্ দিয়ে যখন জাহাজ যাচ্ছিল সে দেখল নীল জলের মহাসাগর পেরিয়ে সে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। তারপর জানল সে এক বণিক জাহাজে চড়ে ইণ্ডিয়ায় যাচ্ছে। সেইখান থেকেই তার জীবন শুরু। তাই সে দেশের পোষাক ছাড়া আর কিছু শরীরে রাখেনি।

আলভাও এসেছিল তেমনি অতর্কিতে। এই হুগলী বন্দরেই একদিন জাহাজ থেকে নামছিল, সে মদ সওদা করছিল। কতকগুলি হন্যে পর্তুগীজ তাকে সেণ্টার দেবার জন্যে ব্যগ্র। কিন্তু সে তাদের কাছে না গিয়ে দিগো রিবেলীর কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, হ্যালো, হাউ ডু ইউ ডু। তুমি কি আমাকে সঙ্গ দিতে পার?

দেশের মেয়ে। তারপর স্ব-ইচ্ছায় সে আত্মসমর্পণ করছে। তার প্রতিও তো কর্তব্য আছে! তবু নিজের জন্মভূমিটা যেন বিস্মৃত হতে পারে না।

আলভাকে চার্চে নিয়ে গিয়েই বিয়ে করেছিল। সাহেবী ফাংশন।

সেই আলভা তার স্ত্রী। আলভা সাধ্বী স্ত্রীর মতই অন্তঃপুরের সব ঝঞ্ঝাট পালন করে।

সেই মেয়েদের জল নিয়ে ঝগড়া এত সপ্তমে উঠেছিল যে আলভা শান্ত করতে পারে নি। দিগো যখন বিশ্রামের জন্যে অন্তঃপুরে ঢুকছে হঠাৎ একদল মেয়ের এক জোট চিৎকার তার সামনে এসে আছড়ে পড়ল।

তারা সকলেই চাইল সাহেবের কাছ থেকে বিচার। কিন্তু দিগো রিবেলী হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তখন ক্লান্তিতে তার মাথা দুলছে। মদের নেশায় চোখ লাল। তা ছাড়া আদিম কামনাটা সারাদিন পর কেমন যেন সন্ধ্যে থেকে মাথার মধ্যে জমতে থাকে। তখন শুধু কোন একটি পুষ্ট যৌবনবতীকে নিয়ে তার নরম শরীরে মুখ ঘষতে ঘষতে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু ঐ এক গুচ্ছ রণরঙ্গিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনী, মোহিনী মেয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ে যা করতে লাগল তাতে করে দিগো রিবেলীর মেয়েদের ওপর থেকে সেই রাত্রের সমস্ত আকর্ষণ চলে গেল।

আলভা দূরে দাঁড়িয়েছিল।

আলভার সাহায্য নিতে হল। তারপর আলভার সাহায্যেই তাদের জানানো হল, আগামী কাল থেকে সবার জন্যে নদী থেকে জল আসবে।

সে রাত্রে আর এই ঝগড়াটে মেয়েদের ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে হয়নি! আলভার ঘরেই ঢুকেছিল।

সন্ধ্যের একটু আগেই দিগো রিবেলী বাড়ীতে ফিরল। নিজের ঘরে বসে প্রচুর মদ খেল।

আলভাও বলল সম্রাটের হুকুম। সুবাদারের আদেশ জারী চিঠি এসেছে জানালো।

দিগো রিবেলী শুনে ওদিকে মন দিল না। আলভাকে বলল, ড্রিঙ্ক সার্ভ কর।

আলভা মাথা নিচু করে মদ পরিবেশন করল।

কয়েক গ্লাস খেয়ে তারপর আলভাকে বলল, একটা গান কর।

আলভা পিয়ানোর সামনে বসে একটি ধর্মসঙ্গীত গাইল।

অর্ধেক গাওয়া হয়েছে, হঠাৎ চিৎকার করে থামিয়ে দিয়ে দিগো রিবেলী লাল চোখ তুলে জড়িতকণ্ঠে বলল, কে তোমার কাছ থেকে ধর্মসঙ্গীত শুনতে চেয়েছে? হটস্ লাভ সঙ্গীত গাও।

আলভা মনের বেদনাটা উপশমের জন্যে পিয়ানোর রিড টিপে একটা ভাল সুর বাজাতে লাগল।

বড়বৌ মরিয়ম ঘরে ঢুকল। তার পোষাক বিচিত্র। সেও সুন্দরী ,তবে বড় লম্বা ও চওড়া। পরে এসেছিল একটি গাউন। কিন্তু গাউন পরে তার শরীরটা কেমন বেঢপ দেখাচ্ছিল। হাসতে হাসতে বলল, সাহেব দেখো আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

দিগো রিবেলী তার দিকে বড় লাল চোখ দুটো তুলে তাকাল, তারপর ভ্রুকুটি করে বলল, মোটেই তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে না। মেমসাহেব হয়েছ কেন? আমি এ পছন্দ করি না।

মরিয়ম ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, বারে. তোমার মেমসাহেব স্ত্রী যে গাউন পরেছে।

পরুকগে, ও ওর জাতীয় পোষাক, তুমি তোমার পোষাক পরবে।

আমার বুঝি মেমসাহেব হতে ইচ্ছে করে না! তুমি আমার সাহেব হাসব্যাণ্ড কেন?

দিগো রিবেলী বিরক্ত হল, বলল, মরিয়ম তুমি এখন এখান থেকে যাও। বিরক্ত কর না।

মরিয়ম কি ভেবে বিদায় নিল।

দিগো রিবেলী উঠে দাঁড়াল। কোমরে পিস্তল, হ্যাণ্ড থেকে চাবুকটা তুলে নিল।

আলভা তাড়াতাড়ি কাছে এসে হাত ধরল। বলল, ডারলিং আজ না হয় ওখানে না গেলে?

দিগো রিবেলী আলভার দিকে ঘৃণাদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, লোভী ভগ, দূর করে দেব একদম। দিগো রিবেলীর নেশা জড়ানো চোখ জলছে।

আলভা অপমানিত হল, তবু বলল, তুমি ড্রিঙ্ক করেছ বেশি, সেইজন্যে বলছি। তুমি অন্য কারও ঘরে যাও। আলভা লজ্জায় মাথা নত করল।

না, আজ তার কাছেই যাব। ড্রিঙ্ক করলেও আমি ঠিক আছি বলে দিগো রিবেলী আর দাঁড়াল না। চাবুকটা হাওয়ার বুকে আছড়াতে আছড়াতে সেই হারেম অন্তঃপুরের দিকে এগিয়ে চলল।

রাত জমে উঠেছে। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। গাছ গাছালির বুকে যেন কি এক ইশারা। আজও বাইরে জ্যোৎস্না ফোটেনি। শুধু তারা আর জোনাকি। আকাশে সলমা চুমকির মত তারার আলো। নিচে বনজঙ্গলের আঁধারে জোনাকিরা জ্বলছে।

দিগো রিবেলী এগিয়ে চলেছে চল্লিশটি ঘর পেরিয়ে। যেতে যেতে হীরার মুখটি তার মনে পড়ল। নিটোল দেহের অসামান্য যৌবন যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের রক্ত কেমন যেন লাফাতে লাগল।

মেয়েদের যৌবন এই এদেশের জীবন নিয়ে অনেক ভোগ করেছে। ঐ মরিয়ম, অহল্যাবাঈ, সরমা, আলতা, তারা যেন আজ আবর্জনার মত। তার চল্লিশটি রক্ষিতা। তাদের শরীর ছুঁতে ছুঁতে তাদের শরীরের সব রহস্য জানা হয়ে গেছে। যেন নদীর স্রোতের মত সব তরল হয়ে গেছে। দু'চার-দিন একটি মেয়ের ঘরে রাত কাটালে আর তার কাছে যেতে ইচ্ছে করে না। এমন কেন হয় সে জানে না। অথচ প্রথম দেখে শরীরটা যেন কেমন করে। কেমন যেন শরীর থেকে বেরিয়ে আসে এক দানবের শক্তি।

হয়ত এই হীরার বেলাতেও সেই একই ইচ্ছার পুনরাবৃত্তি হবে। কিন্তু তার আগে কি দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ? মনে হয় যেন এই রাতে তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে রক্তাক্ত করে দেবে। দিগো রিবেলী কি এক আসুরিক শক্তিতে শক্তিবান হয়ে চাবুকটা হাতে চেপে ধরে এগিয়ে চলল।

কে একটি মেয়ে পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে তাকে দেখতে পেল। চোখে এক ধরণের ভঙ্গি করে আর সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে আকর্ষণ করতে গেল। কিন্তু দিগো রিবেলী চাবুকটা তুলে ধরতে মেয়েটি হাতটি সরিয়ে নিল। তারপর মেয়েটিই ক্ষুব্ধস্বরে বলল, আমায় চেনোনি সাহেব, আমি সুন্দরবনের মেয়ে। বাপ ছিল শিকারী, আমি কত বাঘ মেরেছি বাপের তীরধনুকে। একদিন তোমাকে শেষ করে দেব এ তোমায় বলে রাখছি।

দিগো রিবেলা উত্তর দিল না, একটু দ্রুত পা চালিয়ে তেরো নম্বর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকেই অন্য মেয়ে দেখে রক্ত তার মাথায় উঠল।

সেই মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, এসো সাহেব!

মেয়েটি চেনা। একে যেন আগে ভোগ করেছে সে। শরীরটা দেখে মনে হচ্ছে কোথায় কোথায় তার স্পর্শ ছুঁয়ে আছে। কিন্তু সে কথা না ভেবে দিগো রিবেলী হঠাৎ গর্জে উঠল, ব্লাডি সোয়াইন, তুম্ হিঁয়া কাঁহে। উও কাঁহা গিঁয়া।

মেয়েটি কিন্তু ভয় পেল না। বুকে জোয়ার তুলে চোখে কটাক্ষ সৃষ্টি করল। বলল, ও কোথায় গেছে জেনে লাভ কি সাহেব? এসে যখন পড়েছ, আজ এখানেই কাটিয়ে যাও। আমার সুরত কি তোমার পছন্দ নয়? মেয়েটি দিগো রিবেলীর দিকে গা দুলিয়ে এগিয়ে এল।

ব্লাডি, সোয়াইন, সব চাবুক মেরে ঠিক করে দেব। দিগো রিবেলী রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘর ছাড়ল।

ঘরের বাইরে আসতেই আলভাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। আলভা কেমন যেন ভীতদৃষ্টিতে, পাংশুবর্ণ মুখ নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বামীকে দেখে সে কম্পিত হল।

আলভাকে দেখে যেন পর্তুগীজ সাহেব তার লাল রক্তের উত্তাপ ভুলতে পারল না। যত রাগ আলভার ওপর চাপিয়ে দিল। চাপাবার কারণও ছিল। এই মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার। তাই আলভাকে দেখে দিগো রিবেলী হীরাকে না পাওয়ার আক্রোশে ফুলে উঠল। কোন কথা না বলে হাতের চাবুক বাতাসে আন্দোলিত করে উন্মত্ত সাহেব আলভাকে এলোপাথারি মারতে লাগল। সোয়াইন, ডগ, বিস্ট, নানা গালাগালির ফুলঝুরি বর্ষণ করে অন্তঃপুরের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করল।

আলভা কিছু বলতে গেল। চাবুকটা চেপে ধরতে গেল। তারপর হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল।

কিন্তু উন্মত্ত সাহেব যেন উন্মাদ হয়ে কি এক ভয়ঙ্করের দিকে এগিয়ে চলল।

ঘরগুলি থেকে মেয়েগুলি ছুটে এল কিন্তু কাছে এগিয়ে আসতে সাহস করল না। দূরে দাঁড়িয়ে তারা আতঙ্কে চোখে হাত চাপা দিল।

হঠাৎ দিগো রিবেলী আলভার ক্ষতবিক্ষত, চাবুকের আঘাতে ফোলা ফোলা বিকৃত দেহটি টানতে টানতে নিয়ে চলল। উত্তেজনায় রিবেলীর শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছে। চোখ দুটি আরও লাল। হাঁপাছে। বুকটা তার ওঠা নামা করছে। তখনও বলছে, আজ তোকে শেষই করে দেব। এত বড় আস্পর্ধা, আমার সখের জিনিস, সরিয়ে দিয়েছিস! আলভাকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গেল দিগো রিবেলী। আলভার তখনও জ্ঞান ছিল, শুধু কোমল অঙ্গ চুঁইয়ে রক্ত ঝরছিল। স্কার্টটা ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে। সুন্দর মুখখানি চাবুকের আঘাতে কেমন যেন বীভৎস। জল গড়িয়ে গাল ভেসে যাচ্ছে। হঠাৎ পিস্তলের শব্দ হল। একবার নয় দুবার।

আলভা আর কথা বলতে পারল না। একটা চিৎকার তুলতে গিয়ে না পেরে তার নিস্পন্দ দেহ মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

দিগো রিবেলী তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে মৃত আলভার দিকে। তখনও তার হাতে উদ্যত রিভলবার।

হঠাৎ যেন তার সব উত্তেজনা কমে গেল। কেমন যেন রাতের রহস্যময় প্রবৃত্তির শক্ত বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়ে বুঝতে পারল, সে কি করে ফেলেছে! কিন্তু যা করেছে তাতো আর ফিরে আসবে না! যে গুলি হাত থেকে ছিট্‌কে গেছে সে রক্ত নিয়েই মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিন্তু দিগো রিবেলী পিস্তলটাকে দূরে ফেলে দিয়ে ঢক্ ঢক্ করে মদ গিলল, তারপর অন্ধকার পথে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকা আতঙ্কিত মেয়েদের দিকেও ফিরে তাকাল না। এমন কি সরমা যে শান্তচোখে, কমনীয় মুখ নিয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে এসে দাঁড়িয়েছে,

যে সরমার মুখ দেখলে দিগো রিবেলী ভুলতে পারে না, সেই সরমার দিকেও না তাকিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে চলল।

বাইরের আকাশে তখন জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ ঐশ্বরিক আলো। অশরীরী গাছগুলি যেন অতীতের হারানো আদিম পিপাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুমে অচেতন আর সব।

দিগো রিবেলী সেই ঘুমন্ত গ্রামের পথ দিয়েই যেন কোথায় এগিয়ে চলল।

●

● ●

আলভা দোষ অবশ্য করেছিল। সে যে কেন হীরাকে সরিয়ে দিল সে নিজেই জানে না। সেদিন সকালে সেই এসে প্রস্তাবটা হীরার কাছে তুলে ধরেছিল।

হীরা শুনে আশ্চর্য হয়েছিল। হীরাও চাইছিল। হীরাও চাইছিল এমনি একটু কিছু। আজ না পালালে আজ আর রাত্রে সাহেব তাকে রেহাই দেবে না।

তবু আলভার কথা শুনে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কৌতুক করে জিজ্ঞেস করে, তোমার এতে স্বার্থ? সাহেব যখন জানতে পারবে?

আলভা কথা বলেনি। শুধু অনেক পরে চাপাকণ্ঠে অস্ফুটস্বরে বিচিত্র শব্দ করেছিল।

হীরা খিল খিল করে হেসে উঠেছিল।

আলভা রাগতকণ্ঠে বলেছিল, তুমি হাসছ কেন? তোমাকে মুক্তি দিতে চাইছি, নেবে না?

বললাম তো, তোমার কি স্বার্থ আছে বলো, তাহলে আমি রাজী হতে পারি।

আলভা এবার স্পষ্টস্বরে বলেছিল, তুমি মেয়ে হয়ে এ কথা বোঝো না? স্বামীকে আমি নিজের করে পেতে চাই।

হীরা আবার হেসে উঠেছিল। তারপর হাসি প্রশমিত হলে বলেছিল, মরেছ তুমি? সাহেবের তো অনেক সোহাগী! তুমি আমাকে সরিয়ে দিয়ে কি করবে? সাহেব আবার বাজার থেকে কিনে আনবে।

তা আসুক, তুমি যাবে কিনা বলো।

হীরা আর আলভাকে চটায়নি। আলভার হাত ধরেই দিগো রিবেলীর অন্তঃপুরের বেষ্টনী ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল। হীরা মনে মনে এই চাইছিল। পালাতে হবে কিন্তু কেমন করে পালাবে সে জানে না। তাই বাইরে বেরিয়ে এসে সে মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিয়েছিল। কোথায় যাবে তাও তার জানা ছিল। যে জন্যে হুগলীতে পালিয়ে এসেছে, সেই মুক্তি, মুক্তিই সে পেতে চায়।

সকালের রোদ্দুরটা সবুজ ঘাসের বুকে খেলা করছে। ধোয়া কাপড়ের মত আকাশ নীলের ছোপ বুকে নিয়ে জেগে আছে।

দিগো রিবেলীর বাড়ীটা নদীর তটভূমি ছেড়ে একটু ভেতরে।

ধানীজমি, হলুদ ধানের সোনালী বর্ণ নিয়ে ধানচারাগুলি রোদে ঝলমল করছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। পুকুরে সাহেবদের দাসদাসী।

হীরাকে দেখে অনেকে চোখ তুলল। হীরার পরণে সেই দিগো রিবেলীর পোষাক। হীরা খুব দ্রুত চলছিল। মনে ভয়, যদি সেই সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে আর পালানো হবে না। কেনা বাঁদী, জোর তার আছে। তাকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারে।

আমগাছের ডালে শালিক বসে কিচির মিচির করছে। অশ্বত্থ গাছের লম্বা পাতায় রোদ্দুরের ঝিলিক।

হীরাকে দেখে অনেকে চোখ ঘোরাচ্ছিল। হীরার যৌবন দেখে। ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত পর্তুগীজ চাষীরা শিষ দিয়ে উঠল।

একজন চাষী ধান গাছের চারা লাগাতে লাগাতে গান গেয়ে উঠল।

একজন চোখ ঘুরিয়ে বলল—কে রে? কোথায় যাচ্ছে? ধরে নিয়ে আয় না?

হীরার কানেও সে কথা গেল। সে চোখ ঘুরিয়ে সেই বক্তাকে দেখল।

হীরা কোনদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে চলল। তার চলার তালে তালে সমস্ত অঙ্গ দুলতে লাগল। কামিজ ভেদ করে তার ফুটন্ত যৌবন ফুলের মত হাওয়ায় ভেসে ভেসে নৃত্যের ছন্দে এগিয়ে চলল। যে চাষী ধরে নিয়ে আয় বলেছিল তার দিকে কয়েকবার ফিরে ফিরে হীরা দেখল।

বেচারার লিকলিকে চেহারা। চোখের মধ্যে শুধু লালসা থকথক করছে। হীরা মনের মধ্যে হাসির ঢেউ ছড়িয়ে দিয়ে আরও শরীরটাকে দুলিয়ে দিল।

ওপাশ থেকে সেই চাষী বলল—বাপরে বাপ, যেন সাপের মত ছোবল দিচ্ছে।

হীরা অন্য পথ ধরল! কোন পথই সে জানে না। শুধু আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে চলা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, আর চলতে পারল না। যে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল তাকে দেখে চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন হাসিতে ভেঙে পড়ল সে। বলল, মুরোদ নেই শুধু দেখার সাধে আত্মহারা। ছিলে কোথায় বাপু কাল, কাল ঐ বুড়োটার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারলে না!

হীরা আবার হেসে উঠল, তারপর পথরোধকারীর গা বেয়ে ডিঙিয়ে ওপাশে চলে গেল।

হীরা আবার চলতে লাগল। হারিয়ে যাওয়া সাহসটা তার ফিরে এল। আর ভয় থাকল না। ভয় তার এমনই খুব একটা ছিল না। এমন কি দিগো রিবেলীর সামনে পড়লেও যে সে ভয় পাবে না এমন মনে হল।

যে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল সে সেই দাসবাজারের পাহারাদার রক্ষী পর্তুগীজ যুবক। যার চোখের দৃষ্টির ভাষা পড়ে হীরা উচ্ছল হয়েছিল।

কিন্তু সে ঘটনা গতকাল চুকে বুকে গেছে। হীরা ভুলেও গিয়েছিল তার কথা। একটি তরুণ ছেলে, সবে মুখটিতে গোঁফ দাড়ি উঠে পাকতে শুরু করেছে। চোখে হয়ত রঙ লাগে কিন্তু তারপর আর কি? আসল জায়গায় আসতে এখনও অনেক

দেরি। সেই জন্যে হীরা তাকে নিয়ে এক গাদা মেয়ের মধ্যে ছেলে ভুলানো খেলা খেলেছিল। তারপর ভুলে গেছে।

পর্তুগীজ যুবকটি পা মেলাতে পারছিল না। তার পরনে সেই আগের পোষাক। এবার টুপিটি অনেকখানি তুলে দিয়েছে।

সোনালী চুলগুলি সোনা রোদে ঝিলমিল করছে।

নীল চোখে কেমন যেন দৃষ্টি।

এই ম্যাডাম, আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় ভাল সেণ্টার দেব।

হীরা ঘুরে দাঁড়াল। মুখে তার দুষ্টুমির হাসি। বলল, পারবে? যদি পারো, তাহলে আমি তোমার···

যুবকটির নাম মাইকেল গারসিয়ান। থাকে ঐ পর্তুগীজ দুর্গের মধ্যে। চাকরি, দাসবাজারে পাহারা দেওয়া।

হীরার কথায় মাইকেল যেন সাহসী হল। বলল, দেখোই না আমার ক্ষমতা।

তাহলে তখন কেন সে সাহস দেখাও নি, তাহলে তো আমাকে এত হুজ্জতি পোয়াতে হত না।

মাইকেল কোন জবাব দিল না। হঠাৎ অন্য একটি পথ ধরে বলল, এসো, আমি তোমায় লুকিয়ে রাখব।

হীরা হঠাৎ বড় বড় চোখ করে মুচকি হাসল, বলল, থাক সাহেব, তোমাকে আব কষ্ট করতে হবে না। আমি এখন যাব তোমাদের গির্জায়। তারপর তোমাদের ধর্ম নিয়ে যা হয় করব।

মাইকেল মাথা নেড়ে খুশি হয়ে বলল, না, না ওসব করতে হবে না। তোমাকে আমি বিয়ে করব, তাহলে আমাদের ধর্মে এসে যাবে।

বিয়ে করবে? হীরা মুখ টিপে হেসে বড় বড় চোখ মেলে তাকাল।

তারপর কি ভেবে বলল, কথাটা মন্দ বলনি সাহেব? তোমাকে আমি একটু বিশ্বাস করতে পারি। আচ্ছা, চলো কোথায় নিয়ে যাবে? তোমার দৌড়টা একবার দেখে আসি। মাইকেলের পিছু পিছু হীরা এগিয়ে চলল।

ওরা এগিয়ে চলল সেই ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের পল্লীর দিকে। যেতে যেতে তারা দেখতে পেল দাক্রুজ ধর্মযাজক মাঠে মাঠে ফুলের বীজ ছড়িয়ে চলেছে।

দা ক্রুজ তাদের দিকে একবার চাইল।

হীরাও তাকে দেখল। তার যেন ফাদারকে কেমন ভাল লাগল।

হাওয়ার বুকে রোদ্দুরটা ঘুরছে। চেনা চেনা এ দেশের লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হীরা যত এগোতে লাগল, তত মানুষগুলিকে যেন তার চেনা লাগতে লাগল। মনে তার আত্মীয়তার সুর জেগে উঠল। মাইকেলকে জিজ্ঞেস করল, এরা কারা! এদের সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ কি?

মাইকেল বুঝিয়ে দিল সম্বন্ধটা।

শুনে হীরা তাকিয়ে রইল। খৃষ্টান ধর্মের নতুন মানুষ। মুক্তি পাগল ক্রীতদাসের

দস্য ধর্ম করেও বাঁচবার চেষ্টা করছে। তারপর ভাবল, সেও তো তাই করতে চলেছে! তার জন্যেই তো সে এত পথ এসেছে। হঠাৎ মাইকেলের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

মাইকেল মৃদু হাসল, বলল, বিশ্বাস করে এসো।

তারপর এগিয়ে গিয়ে সারি সারি নতুন খড়ের চালের ঘরের এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল।

মাইকেল কার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল।

ঠিক কোন গ্রাম্য অধিবাসীদের পর পর ঘরের দাওয়া। ধানের মরাই আছে, হাঁস মুরগী চরে বেড়াচ্ছে। লাউয়ের ডগা ঘরের চালে উঠেছে। পেঁপে গাছে ফল ধরেছে শুধু স্বতন্ত্র নারী পুরুষের পোষাক। কেমন যেন দেশী শরীরে বিদেশীর ছাপ।

মাইকেল ডাকতে কে যেন একটি ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এ দেশী লোক, কাল চেহারা, পরেছে সাহেবী পোষাক। মাইকেলের সঙ্গে পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলল। তারপর হীরার দিকে তাকিয়ে এ দেশী ভাষায় মৃদু হেসে বলল, তুমি নিশ্চিন্তে এখানে আশ্রয় নিতে পার। মাইকেল আমার ছোট ভাইয়ের মত। তাছাড়া আমরা এখন পর্তুগীজ সরকারের অধীন, একদিন এ দেশে পর্তুগীজরা রাজা হবে আর তাদের ভক্ত প্রজা হব আমরা। আমাদের স্থান প্রথম সারিতে কে আটকায়? এই বলে এ দেশী কালো লোকটি সাদা দাঁত মেলে হা হা করে হাসল। তারপর নিয়ে গেল একটি ঘরের মধ্যে।

ঘরও সেই বাংলা দেশের কোন এক পল্লীর মত। তবে ঘরের দেয়ালে ঝুলছে মেরী মাতার ছবি। আর ঘরের মাঝে পাতা চেয়ার টেবিল। সেই কালো দেশী সাহেব লোকটি তাদের চেয়ার টেবিলে বসতে দিল।

হীরা তাকিয়েছিল ঘরের আসবাবের দিকে।

লোকটাও একটা চেয়ার অধিকার করে বসল, তারপর কি ভেবে জামার ভেতর থেকে গলার কারে ঝোলানো লম্বা ক্রুশটা বের করে চোখ বুজে কাকে যেন ডাকল, তারপর জামার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে হেসে বলল, পাপ কথা মনে আসছিল, তাই আওয়ার লেডির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম।

মিসেস ঘরে এসে ঢুকল। তাকে দেখে মনে হল অন্য কোন ভারতীয়। অন্তত মুখখানি বাংলা দেশের মত নয়। তাকে দেখিয়ে কালো লোকটা বলল, আমার মিসেস, সবই আওয়ার লেডির কৃপায় পেয়েছি। তা এ বেশ ভালই হয়েছে। ছিলাম এক গণ্ড গ্রামের নাপিত বংশের ছেলে। জাত ব্যবসা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। সাহেবের কৃপায় জাতে উঠে গেলাম। এখন ফাদারদের দাক্ষিণ্যে মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থালী।

মোটামুটি রূপসী মিসেস এসে হীরার হাত ধরল। কালো লোকটা বলল, আমাদের মাইকেলের ইয়ে, বুঝতে পারছ। খাসা কিন্তু। লোকটা হাসল।

মিসেস কেমন যেন দৃষ্টি দিয়ে স্বামীকে তিরস্কার করল।

মাইকেল মৃদু হেসে বলল, স্যামুয়েল, তাহলে আমি যাই। ডিউটি খতম হলে নাইটে আসব। মাইকেল উঠে দাঁড়াল। আর স্যামুয়েল তাকে বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

স্যামুয়েলের হিন্দু নাম ছিল কালিপদ। পদবী পরামাণিক।

মিসেস স্যামুয়েলের এ দেশীয় যে নাম ছিল কেউ জানে না। সে ঐ দাসবাজারের বণিক সর্দারের হট্টগোলে হারিয়ে গেছে। এখন সে মারিয়া পরামাণিক। মারিয়া হীরার দিকে তাকাল, তারপর মৃদু হেসে বলল, এসো ভাই, তোমাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিই।

হীরা আর তখন কিছু ভাবছিল না। ধর্ম হাবানো এদেশী লোকদের খৃষ্টান গৃহস্থালী দেখছিল। সবই বাংলা দেশের পল্লী ছবি। সেই ধানের মরাই, ঢেঁকি কোটার শব্দ। খড়ের চালে লাউ, কুমড়ো ঝুলে আছে। উঠোনে হাঁস মুরগী চরছে। গোয়ালে গরু জাবর কাটছে। পেঁপে গাছে পেঁপে, বেগুন গাছে বেগুন। গ্রীষ্মের চড়া রোদে কাঁঠাল পাকছে।

হীরার কি যেন মনে পড়তে লাগল। কোথায় যেন হারিয়ে যাওয়া বিস্মৃতির অতলে ছোট্ট একটু স্মৃতি।

এমনি একটি পল্লীর সোনা রোদে রাঙানো মাটির ঘর। দুরন্ত সে দিনগুলি তিরস্কারের মধ্যে দিয়ে কেটে যেত মধুর কত স্বপ্ন নিয়ে। মেয়ের সব জায়গায় যেতে মানা। পুকুরে যাসনি পড়ে যাবি, রোদ্দুরে ঘুরিসনি রঙ কালো হয়ে যাবে। মেয়ে হয়েছিস্ মনে নেই, ছেলেদের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াস্। হীরার যেন সে সব কথাই আজ মনে পড়ে।

মনে পড়তে বুক চিরে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। হঠাৎ আচমকা ব্যাণ্ডেল গির্জা থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে। সে চমকে উঠে বর্তমানে ফিরে আসে।

তারপর কেটে যায় তিনদিন। মাইকেল এই তিন দিনে কবার এসেছে। হীরা আগের মত আবার উচ্ছল। মাইকেল এলে হীরা আরও উচ্ছল হয়। তার মনে প্রজাপতির মত রঙের ঘোর লাগে। এ দিগো রিবেলী নয়, দেনা পাওনা নিয়েই তার কারবার। মাইকেল তরুণ। লাজুক লাজুক চাউনি দিয়ে কি যেন জড়ানো স্বরে বলতে চায়। তখন হীরার বুকে সমুদ্রের জোয়ার ওঠে। আকাশের রঙ ফেরা দেখে। সে আর আগের মত মাইকেলকে নিয়ে পরিহাস করে না। ডাগর চোখে কটাক্ষ হেনে তাকায়। মুখ টিপে হেসে ঘন হয়ে মাইকেলের পাশে বসে।

মারিয়া বলে, তোমরা দেরী করছ কেন বাপু? চার্চে গিয়ে ম্যারেজটা সেরে এস।

হীরাও যেন নিজের মনের কথা বুঝতে পারে।

মাইকেল কিছু বলে না।

ওরা নদীর দিকে যায় না। দুর্গের দিকে হাটে না। ঘুরে বেড়ায় নতুন খৃষ্টান

পল্লীর আনাচে কানাচে। মাইকেল নিজের দেশের গানের সুরে সিটি বাজায়। হীরা শুনে পুলক অনুভব করে।

দূরে ব্যাণ্ডেল গির্জার দিকে উপাসনার জন্যে যায় পল্লীবাসীর দল। হীরা তাকিয়ে দেখে। এত সুখ, এত শান্তি, তবু যেন কিসের ভয়ে সে এক সময়ে মুষড়ে পড়ে। তখন মাইকেলকেও তার ভাল লাগে না।

মাইকেল কোন অসভ্যতা করে না। কোনদিন কোন কথা বা ইঙ্গিত। শুধু পাশে বসে। হয়ত ঘন হয়ে বসে। বসে কাতর চোখে তাকিয়ে থাকে। চোখ দুটোয় কিসের যেন দৃষ্টি। হীরার মনে হয় মাইকেল বিদেশী নয়। তাদের দেশেরই কোন তরুণ যুবক। তাকে ভালবেসে সব কিছু দিতে চায়।

প্রজাপতি ফুলের বৃন্তে বসে কি যেন তুলে নেয়। আনন্দে দুলে ওঠে ফুলের তনু।

রাত নামে কি যেন ঘোর নিয়ে। হীরা তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভুলে যায় সব। তবু যেন তার কেমন ভয় করে? অন্ধকার রাতে গাছের পাতা নড়ে উঠলে তার বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। তার মনে হয় মাইকেলের সঙ্গে তার ঘর বাঁধা হবে না। কেউ যেন তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে। দিগো রিবেলী নিশ্চয় তাকে খুঁজছে, সেই কিনা তাও সে বুঝতে পারে না। তাই সব আনন্দ সব খুশি, মনের রঙবদল মাঝে মাঝে সব ভুলিয়ে দেয়, আবার মনে পড়লে সে মাইকেলের সঙ্গে কথা বলতেও ভুলে যায়।

মাইকেল তার এই ভাব পরিবর্তন দেখে মৃদুকণ্ঠে বলে, তুমি কিসের জন্য এত ভয় পাচ্ছ? সেই বুড়ো সাহেবটা তোমার কোন খোঁজই পাবে না। তাছাড়া খোঁজ যদি পায়, যে টাকা দিয়ে তোমায় কিনেছে, দিয়ে দেব। এবং একটা খবর অবশ্য জানো না, মিঃ রিবেলী তার পর্তুগীজ স্ত্রীকে নিজের পিস্তল দিয়ে হত্যা করেছে।

শুনে হীরা চমকে ওঠে। কাগজ সাদা মুখে বলে, কারণ?

কারণ কি কেউ জানে না। তারপর মাইকেল তাচ্ছিল্য ভরে বলে রিবেলীর ওপর কেউ খুশি নয়। লোকটা পাকা একটা শয়তান।

হীরা হাসতেও পারে না, কিন্তু আলভার মুখটা মনে পড়তে তাকে পালানোর সাহায্য করার ঘটনাটা মনে পড়ে। বেচারী আলভা! তাকে সরিয়ে দেবার জন্যেই রাগে রিবেলী তাকে খুন করেছে।

হঠাৎ একদিন বন্দর ঘাটা থেকে স্যামুয়েল পরামানিক দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি এল। হাঁফাতে হাঁফাতে যা বলল তা রীতিমত ভয়াবহ।

বাদশাহ শাহজাহানের একটি বাঁদীকে পাওয়া গেছে কিন্তু সে মৃত। বণিক ফেডরিক আগ্রা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে এক জঙ্গল থেকে সেই মৃতদেহ তুলে এনেছে।

আরও খবর যোগাড় করেছে, আর একটি বাঁদী নাকি এই হুগলীতেই এসেছে। তবে কবে দাসবাজার থেকে বিক্রী হয়ে গেছে কেউ বলতে পারে না।

ফেডরিক সেনাপতি ডি মিলোকে আশ্বাস দিয়েছে, ভাবনার কিছু নেই, একজনকে যখন পাওয়া গেছে তখন অন্য জনকেও পাওয়া যাবে। সে ভার ফেডরিকই নিয়েছে। এখন মুঘল সুবাদার কাশিম খান জুয়িনীর কাছে সেই বাঁদীর মৃতদেহ পাঠান হচ্ছে।

স্যামুয়েল এই কথা পৌঁছে দিয়ে আবার দুর্গের দিকে চলে গেল।

তখন দুর্গের মধ্যে ভীড়ের চাপ অত্যধিক। বাঁদীর দুর্গন্ধময় গলিত মৃতদেহ বাইরের খোলা জায়গায় রাখা হয়েছে। সবারই নাকে কাপড চাপা দেওয়া। সুন্দর দেহটি কি এক আতঙ্কে বিস্ফারিত। চোখে মুখে আতঙ্ক নিয়ে বড বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। মাছি ঘুরছে দলে দলে। মেয়েটির শরীরে একটি সালোয়ার ও কামিজ, তবে মূল্যবান। এবং এমন রকমারী যে সম্রাটের অন্তঃপুর ছাড়া এ মূল্যবান পোষাক কেউ পরতে পারে না। এই পোষাক দেখেই ফেডরিক ধরেছে। এ সেই হারানো বাঁদী। মেয়েটির ওপর যে বলপ্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে তা তার চেহারা দেখেই বোধ হয়।

ফেডরিক সব কথাই বলেছে। মেয়েটিকে সেই একদিন জঙ্গলে পেয়েছিল। সঙ্গে দু'জন ছিল। একজন তার হাতে পডে ইজ্জত দিয়েছিল কিন্তু মৃত্যু কেমন করে হল সে জানে না। মেয়েটি ইজ্জত দিয়ে তার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। আর একটি ঘটনা সে বলল না, তারই জাহাজে যে আর একটি মেয়ে পরে এসে উঠেছিল, সে কথা চেপে গেল। সে মেয়েটির ইজ্জত নেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে বল প্রয়োগে পারেনি। যতবার চেষ্টা করেছে, মেয়েটি একটা না একটা অস্ত্র নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারপর সেও কি ভেবে ছেড়ে দিয়েছে কারণ তখন জাহাজে ভোগ করবার মত আরও মেয়ে ছিল। এসব কথা ডি মিলোকে বললে সেনাপতি হয়ত অন্য চার্জ আনতে পারে ভেবে চেপে গেল। শুধু বলল, কিছু ভাবনার নেই সর্দার, আমি দ্বিতীয়টিকে খুঁজে দেব। মনে হয়, এ এখানে এসেছে, তারপর অন্য মেয়ের মত বিক্রী হয়ে গেছে।

ফেডরিক সেই দিনটিকে স্মরণ করে রূপসী মেয়েগুলি কার কার কাছে বিক্রী হয়েছে স্মরণ করবার চেষ্টা করল।

এদিকে তখন মুঘল সেনাপতির কাছে মৃত বাঁদীটিকে পাঠাবার তোড়জোড় চলেছে; ডি মিলো সেনাপতির চিঠির উত্তরের খসড়া করে ফেলল: 'এই সঙ্গে একটি বাঁদী পাঠাচ্ছি, দ্বিতীয়টিও বোধহয় পাঠাতে পারব, তবে আর ক'দিন সময় অতিরিক্ত দরকার। পর্তুগীজরা আর যাই হোক, বেইমান নয়। ধর্মের কল্যাণের জন্যে তারা কখনও মানুষের ওপর অত্যাচার করে না। তাছাড়া সম্রাটের পালানো বাঁদী আমরা ফুঁসলিয়ে নিয়ে এসেছি বলে যে দোষারূপ করা হয়েছে তা সত্য নয়। একটি বাঁদীকে আগ্রা প্রাসাদের চল্লিশ মাইল দূরে একটি জঙ্গলে পাওয়া গেছে। তাকে সম্ভবত কোন পশু আঘাত করে শেষ করেছে। আমাদের একজন কমরেড

বহু অনুসন্ধানের পর খোঁজ পেয়েছে। আওয়ার লেডির কৃপায় আমরা ধর্ম বিশ্বাসী বলে এই বিপদে বেঁচেছি। সম্রাটকে লিখবেন, অন্য বাঁদীটিরও খোঁজ করছি। কতকগুলি অসহায় লোক সামান্য ব্যবসার জন্যে এদেশে এসেছে, তাদের অন্যায় ভাবে দায়ী করবেন না। নিজেদের অসাবধানতার গলতি পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার মত মূর্খতা আর নেই।'

চিঠির খসড়া হয়ে গেল।

পর্তুগীজ সরকারের বজরা ঘাটে ভিড়ল। ক'জন সৈনিক সেই মৃতদেহ ধরাধরি করে বজরায় তুলল, ডি মিলোর চিঠি সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

ভিড় কিছু কিছু কমে গেল।

ক্রেতা বিক্রেতা আবার দাসবাজারে গিয়ে জমা হল। দড়িতে বাঁধা, হাতের ফুটোতে জড়ানো, গোয়ালের গরুর মত সব মানুষের পাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছিল।

বিক্রেতা চিৎকার করতে লাগল। ক্রেতা হাত বাড়াল।

এক চোখ কাণা ফেডরিক এক চোখেয় শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে ঘুরতে লাগল। বাজপাখীর মত তার দৃষ্টিতে অরণ্যভেদী রহস্যময়তা। সে স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগল সেদিনের ঘটনা। মৃত মেয়েটির মত মূল্যবান সালোয়ার কামিজ পরা ঐ মেয়েটি যেন কেমন বাচাল। হাসিটা ধারাল। সমস্ত জাহাজ কাঁপিয়ে সে হাসত। রাত্রিবেলা কাউকে ঘুমোতে দিত না। সে নিজেই এসে উঠেছিল জাহাজে।

জাহাজ ভাগীরথীর উজান ঠেলে সারা ভারত খুঁজে মানুষ সওদা করে নিয়ে আসছিল। ফেডরিক তখন জাহাজের উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে। দেখছে বাতাসের গতি। পাল নামিয়ে দেবে কিনা ভাবছে। মদের বোতল হাতে।

সকালের মিষ্টি রোদ্দুর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। খোলা জলের অফুরন্ত স্রোত ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ছে। দু'পাশে অরণ্যের ঝুপিঝাপি সবুজ গাছপালা। নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। সোনালী আলো লেগে, বাতাসের ঢেউয়ে গাছপালা নড়ছে। চিল উড়ছে আকাশে।

পাশ দিয়ে অন্য পণ্যবাহী নৌকাও যাচ্ছে। তারা পর্তুগীজ জাহাজ দেখে ভয়ে পাশ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে।

এ পথ ফেডরিকের চেনা। সারা বছরই এ পথে তাকে যাওয়া আসা করতে হয়। অনেক মুঘল রণতরীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ লেগে যায়। তার রক্ষীরাও তৈরী। জলপথে বাদশার সৈন্যরা পারে না; দূর থেকে বন্দুক তুললেই পালিয়ে যায়।

জলপথে পর্তুগীজদের সঙ্গে পারা এ দেশের কর্ম নয়। তাই তারা সরে পড়ে। সেইজন্যে বাদশাহের রাগ।

একবার মুসলমান তীর্থযাত্রীর হজে যাওয়ার জাহাজ আটক করেছিল। জাহাজের নারী পুরুষদের সে কি কান্না? তারপর বাদশাহের বিশেষ অনুরোধে তাদের ছেড়ে দিয়েছিল।

এ দেশের রাজাকে এখন চটিয়ে কোন লাভ নেই। ধীরে ধীরে সেই মুঘল

শক্তিকে বশীভূত করে তারপর ভারতবর্ষ কেড়ে নিতে হবে। ফেডরিক নিজের মনেই হা হা করে হাসে। এই সব কথাই ফেডরিক সেই জাহাজের উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল।

জাহাজের ভেতর থেকে ধরা মানুষের কলরব ভেসে আসছিল। রক্ষী চাবুক তুলে তাদের থামানোর চেষ্টা করছে।

হঠাৎ ফেডরিক চমকে উঠল কি যেন কানে শুনে। এক চোখ দিয়ে সেই চিৎকার অনুসরণ করে দূরে ভাগীরথীর কিনারে দেখল, দেখল একটি মনুষ্য শরীর জাহাজের দিকে একটুকরো কাপড় উড়িয়ে তাদের ডাকছে।

হঠাৎ সেই কাপড়টাও অসাবধানে উড়ে গেল। তখন সে হাত নেড়ে ডাকতে লাগল।

ফেডরিক এক চোখ দিয়ে শ্যেনদৃষ্টি পাঠিয়ে দিয়ে বুঝল যে ডাকছে সে একজন নারী। দূর থেকেও বোঝা যায় তার ছোট্ট শরীরকে বেষ্টন করে চাকচিক্য পোষাক আলো জেলে সব কিছু পরিষ্কার করে দিয়েছে। ফেডরিকের চোখে খুশি ঝলকে উঠল। এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। যারা দস্যুতা করে মানুষ জাহাজে তোলে, তাদের জাহাজে কেউ স্বইচ্ছায় আশ্রয় নিতে আসে তা এই প্রথম। সে আর দ্বিরুক্তি করল না। হঠাৎ সেই উঁচু অংশ থেকেই লাফিয়ে পড়ল ভাগীরথীর ঘোলা জলে। তারপর সাঁতার দিয়ে নির্দিষ্ট পাড়ে গিয়ে পৌছলো।

মেয়েটি ফেডরিককে দেখেই চমকে উঠল কিন্তু তখন আর উপায় নেই। ফেডরিকও চিনল তাকে। জল থেকে উঠে হাতটা চেপে ধরে শয়তানের মত হেসে উঠল।

মেয়েটি ভ্রূকুটি তুলে বলল, তুমিই তো জুলেখার সর্বনাশ করেছ?

ফেডরিক এক চোখ নাচিয়ে হাসি ছড়িয়ে বলল, আর তুমি পালিয়েছিলে!

কিন্তু মেয়েটি হঠাৎ কেমন যেন প্রগলভা হল। মৃদু হেসে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, মোটেই না। আমি তোমাদের একদম ভয় করি না।

ফেডরিক বলল, ভয় যখন কর না, তবে চল আমরা বনের মধ্যে যাই!

মেয়েটি হঠাৎ ফুঁসে উঠল, ইস্ এত সহজে নাকি?

ফেডরিকের বেশ মজা লাগছিল। তার ভিজে পোষাক থেকে জল ঝরছিল। সে কানা চোখ থেকে জল সরিয়ে দিয়ে বলল, তবে ডাকলে কেন?

তোমার জাহাজ এটা মোটেই ভাবিনি।

এখন তো দেখতে পারছ আমার জাহাজ, তা কি করবে বলো? জাহাজটা দূরে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়েছিল। সেই দিকে তাকিয়ে মেয়েটি কি ভাবল। ওড়নাটা জাহাজকে নিশানা করতে গিয়ে হাত থেকে জলে পড়ে গেছে। ভরাটি বুকটির দিকে সম্পূর্ণ লোলুপ দৃষ্টিতে এক চোখ কাণা সাহেবটা তাকিয়ে আছে। কি ভেবে মেয়েটি বলল, তোমার জাহাজ কি হুগলীতে যাচ্ছে? যদি সেখানে যায় তাহলে আমি যাব। আমি খৃষ্টান হয়ে তোমাদের ধর্ম নেব।

এ মেয়েটা বলে কি? ফেডরিক এক চোখ নিয়েই পিটপিট করে চাইল। এদের নিয়ে যেতে কত মেহনত করতে হয়, আর এই সুন্দরী যুবতী, যার রূপ দেখে হাত পাগুলো নিস্‌পিস্ করছে। হঠাৎ মেয়েটাকে সে কোন কথা বলতে দিল না। ততক্ষণে একটি ছোট্ট নৌকা এসে গেছে। ফেডরিক মেয়েটিকে ঝাপটে তুলে নিয়ে বল খেলার মত ছুঁড়ে দিল নৌকোয়। আর একজন ক্যাচ তুলে নৌকোর মধ্যে বসিয়ে দিল মেয়েটিকে। তারপর নৌকো দাঁড় বেয়ে গিয়ে জাহাজে ভিড়ল।

এসব কোন কথাই ফেডরিক ডি মিলোকে বলেনি।

তাই দুর্গাধ্যক্ষর কাছে বাদশাহের বাঁদীর কথা শুনে জাহাজ নিয়ে প্রথম গিয়েছিল। যেখানে সে জুলেখাকে বলপ্রয়োগ করেছিল।

সেও একটি গভীর অরণ্যসঙ্কুল জায়গা। সেই গভীর বনের সীমানা ছাড়ালে ওপাশে লোকালয়ের বসতি। ফেডরিক নদীতে জাহাজ রেখে কয়েকটি সঙ্গী নিয়ে পার হচ্ছিল। হাতে গ্রাম লুঠ করবার বিবিধ সরঞ্জাম। হঠাৎ একটা চোখই বড় হয়ে যায়। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা। সঙ্গীরা অপর একটির পিছন পিছন ছুটল কিন্তু ফেডরিক এক লাফে জুলেখাকেই ধরে ফেলল। তারপর বলপ্রয়োগ করতে খুব বেশি দেরী হল না, কিন্তু মেয়েটি ছাড়া পেয়েই পালিয়েছিল। ফেডরিক আবার জাহাজ নিয়ে সেখানেই প্রথম গেল কিন্তু সমস্ত বনাঞ্চল তচনচ করেও সেই মেয়েটির দেখা পেল না। অবশ্য দেখা পাওয়ার আশা নিয়ে সে আসেনি। বনের পশু নয় যে নির্দিষ্ট বনের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। তবু যদি পাওয়া যায়, পাওয়া গেলে হুগলী উপনিবেশ সরকারের একটা দুর্ভাবনা কমবে। তাছাড়া এ স্বার্থ সমস্ত পর্তুগীজদের। তখন যদি একবারও বুঝতে পারত তাহলে কি তাদের পালিয়ে যেতে দিত?

ফেডরিক তারপর এল দ্বিতীয় মেয়েটিকে যেখান থেকে তুলেছিল। সেটাও নদীর ধার। তবে আগেরটার মত অতো গভীর বন নয়, বনের মধ্যে গাছপালা আছে, তবে গাছের লম্বা চেহারা সব আকাশমুখী। নিচে শুধু তাদের থামের মত মোটা মোটা শরীর। তাছাড়া বেশ পরিষ্কার জায়গা। খুঁজতে অসুবিধে হল না।

মেয়েটিকে যে নদীর ধার থেকে উদ্ধার করেছিল সে সেই পথ ধরে এগিয়ে চলল, তারপর বনের গভীরত্ব বাড়ল। দু একটি হিংস্র জন্তু পাশ দিয়ে গর্জন করতে করতে চলে গেল। ফেডরিক বন্দুক তুলে ফায়ার করল। অসংখ্য বাঁদর এগাছ থেকে লাফিয়ে ও গাছে পালাল। বনফুল ফুটে রয়েছে। ফেডরিকের সঙ্গেও কজন সঙ্গী। তারাও এ একজন দস্যু। হঠাৎ একজন চিৎকার করে সর্দারকে ডাকল।

আর সঙ্গে সঙ্গে ফেডরিক ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌছল।

একটি মাটির উঁচু ঢিপি, তার মধ্যে গুহার মত। গুহার মধ্যে ঢুকে বেশ নিশ্চিন্তে থাকা যায়। ফেডরিকও সঙ্গীর সঙ্গে ভেতরে ঢুকে যা দেখল তাতে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। গুহার বাইরের আলো যা ঢুকেছে তাতেই বেশ দেখা যাচ্ছে, ফেডরিকের দেখা সেই ইজ্জত হারানো মেয়েটি মরে পড়ে আছে। তাকে পিঁপড়ে

আর মাছিতে ঢেকে ফেলেছে। ফেডরিক বুঝতে পারল না, এর এমন অবস্থা হল কেমন করে? কে মারল একে? ক্ষতস্থান দেখা যায় কিনা দেখবার জন্তে সে মৃতদেহটি উল্‌টে পালটে দিল। তারপর কিছু বুঝতে না পেরে সঙ্গীদের দ্বারা বয়ে নিয়ে জাহাজে তুলল।

তার মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত। তবে দ্বিতীয় মেয়েটি ধরা পড়লে বোঝা যাবে। এরা যে দুজন এক জায়গায় ছিল বোঝা যায়। মনে হয় প্রথম মেয়েটি মারা গেলে বা তাকে মেরে দ্বিতীয় মেয়েটি সরে পড়েছে।

ফেডরিক ভাবতে ভাবতে সেই দাসবাজারে ঘুরতে লাগল। এত ঘটনা ভেতরে আছে যদি জানত তাহলে কখনও সেই মেয়েটিকে সাধারণের মত দাসবাজারে নিলামে চড়িয়ে দিত না। মেয়েটি জাহাজ থেকে নামতে নামতেই বলেছিল, আমাকে খৃষ্টান করবে তো!

চ, চ বেটি আর দিক্ করতে হবে না।

ফেডরিক শুনেছিল তার এক সঙ্গীর কথা।

মেয়েটি তার দিকেও তাকিয়েছিল কিন্তু সে তখন পৈশাচিক এক আনন্দে টলছে। কত মেয়েই তো কত কথা বলে, কে তা কানে নেয়? তাই সেও কানে নেয়নি। তারপর নেমে গেছে দড়ির বাঁধনে আটকে দাসবাজারে।

হঠাৎ চলতে চলতে রক্ষী মাইকেলকে ধরল ফেডরিক। বলল, এই তুমি তো রোজ বাজার পাহারা দাও। থার্টিন সকালে একটি মেয়ে বিক্রী হয়েছে, কে কিনেছে বলতে পার? তার পোষাক ছিল বেশ জমকালো। সালোয়ার, কামিজ পরেছিল, আর বেশ স্ট্রং ইয়ং ছিল। এই বলে ফেডরিক হাতের আকার দেখিয়ে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে হাসল।

মাইকেল মাথা নেড়ে জানাল, সে জানে না।

বাজারে আরও পাহারাদার ছিল তাদেরও দিকে ফেডরিক এগিয়ে গেল। তাদেরও মেয়েটির আকৃতি, কথা বলার ঢঙ সব নকল করে দেখালো। তারা মুচকি হেসে মাথা নাড়ল।

প্রত্যহ কত মেয়ে আসছে, কত বিক্রী হচ্ছে, কেউ কেউ এই উপনিবেশে পর্তুগীজ সাহেবের কেনা হয়ে থাকছে, কেউ খৃষ্টান হয়ে নতুন পল্লীতে ঢুকছে। আবার চড়া দামে কেউ কিনে নৌকা করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কে কার খবর রাখে? থার্টিন কেন, থার্টিন, ফোর্টিন সব তারিখই এক।

একজন পাহারাদার একটু রসিক। ঠিক যুবক নয় আবার প্রৌঢ়ও নয়। সে কোন কাউকেই ভ্রূক্ষেপ করে না। মাথা থেকে টুপিটা খুলে হেসে বলল, সাহেব আমাকে বলে রাখলে আমি সব মেয়ের চেহারা মনের মধ্যে ধরে রাখতাম।

ফেডরিকও রসিকতায় অপটু নয়। এক চোখ টিপে বলল, পারতে না। তোমার তো বয়েস হয়ে গেছে। এত মেয়ের চেহারা মনে ধরে রাখতে গেলে তুমি ভেদবমিতে মারা যেতে।

ফেডরিকের কথা শুনে অনেকে শব্দ করে হেসে উঠল।

রসিক পাহারাদারও আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল। ওপাশ থেকে একজন তাকে চোখ টিপল। বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়। সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে।

ফেডরিক তবু হাল ছাড়ল না। আরও এগিয়ে চলল।

কিন্তু মাইকেল গার্সিয়ান ভাবছে। ভাবছে যেন কি? ভাবছে এই তালে দিগো রিবেলীকে জড়িয়ে দিলে কেমন হয় লোকটা আসল ধূর্ত? বাড়ীটা যেন এক রূপের হাট বানিয়ে রেখেছে। তাদের জাতের লোক। এদেশে এসে পয়সা করেছে। তাছাড়া আদব কায়দা কেমন যেন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। হীরাকে সেই টাকা দিয়ে কিনেছিল। তবে কি হীরা সেই মেয়ে?

বণিক সর্দার ফেডরিক যে চেহারার বর্ণনা দিল তার সঙ্গে হীরার অনেক মিল আছে। হীরাও জমকালো সালোয়ার, কামিজ পরেছিল, যদিও সে পোষাক এখন আর নেই। সে পোষাক নিশ্চয় ঐ কামুক বুড়ো রিবেলীর ওখানে ফেলে এসেছে। হীরা যদি সেই মেয়ে হয়, তাহলে? মাইকেল আর ভাবতে পারল না।

হীরা যদি সেই মেয়ে হয়, তাহলে লুকিয়ে রাখা যাবে না। কানা ঐ বণিকটা যে রকম উঠে পড়ে লেগেছে ঠিক বের করবেই। মাইকেল কেমন মুষড়ে পড়ল। স্যামুয়েলের বাড়ীতে হীরাকে তার মনে পড়ল। হীরা তাকে আবার ভালবাসতে শুরু করেছে। সে আর আগের মত তাকে নিয়ে রগড় করে না। এখন হীরা স্বপ্ন দেখছে একটা ঘর বাঁধার। স্যামুয়েলের স্ত্রী মারিয়ার মত সে গৃহিণী হতে চায়।

হীরা নাচতেও পারে সুন্দর। সেদিন মিউজিকের তালে কি সুন্দর নাচল। যদিও ওয়েষ্টার্ণ ড্যান্স নয়। কিন্তু রাজা মহারাজার রঙমহলে যে নাচ হয় তার মত, হীরা কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নিটোল শরীরকে ভেঙে ভেঙে সমুদ্রের ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ার মত বুকে জোয়ার তুলে নাচল।

হীরা এখন তাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখে। সেদিন বলল, জানো মাইকেল, হঠাৎ ভোরে স্বপ্ন দেখলাম, আমরা চার্চে গিয়ে ফাদারের সামনে দাঁড়িয়েছি! আমরা রিং বদল করলাম। উপস্থিত অতিথিরা আমাদের ফুলের তোড়া উপহার দিলেন। তারপর এক বজরা ফুলের মধ্যে উঠে নদী দিয়ে ভেসে কোথায় যেন চলে গেলাম।

তারপর বলল, আচ্ছা মাইকেল, বল না ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয় না?

মাইকেল মনে মনে পুলকিত হল, বুঝতে পারল সে জয় করেছে এদেশের একটি অসামান্য রূপসী মেয়েকে। বলল, সত্যি হলে কি তুমি খুশি হবে?

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল হীরা। সেই বড় বড় ডাগর চোখে। অন্য সময় হলে হয়ত সেই ডাগর চোখে দুষ্টমির রেখা টেনে তনুতে হিল্লোল ছড়িয়ে দিয়ে হাসত কিন্তু এ সময়ে হাসল না, কেমন যেন লজ্জিত হয়ে মাথা নত করল। তারপর মাথা নত করে মৃদুকণ্ঠে বলল, মাইকেল, আমি দুঃখ পাই এমন কথা নাই বা বললে?

মাইকেল বোঝে না, এই কথার মধ্যে দুঃখের কি আছে?

আজকাল হীরা যেন কেমন হয়ে গেছে। কেমন সুরে যেন কথা বলে? মেয়েদের

সম্বন্ধে ধারণা তার নেই। নিজের দেশের কিছু কিছু জানে, পুসি, সোফিয়া, রোজি এরা তখন যুবতী। তাদের দেখেছে তারাও যেন কি এক আনন্দে ফুলের মত ঘুরে বেড়াত। তারা তখন তার ছোট ছোট গাল টিপে দিয়ে বলত, নাইস যু আর—বড় হলে অনেক লেডির মাথা মুড়োবে।

আজ সে সব কথার মানে বোঝে। বোঝে না এদেশীয় মেয়েদের। এরাও যেন কেমন ? তবে কারুর কাছাকাছি যায়নি। শুধু হীরার কাছে গেছে। হীরাকে দেখে যেন সে তার বুকের মধ্যে কি এক নতুন স্পন্দনের সাড়া পায়।

অভিনব সে অনুভূতি। তাই সে হীরার জন্যে এগিয়েছে। হীরাকে আপন করে পেলে এই ভারতবর্ষে বাসা বাঁধবে। চাকরী আর করবে না! কোথাও আলাদা থেকে ব্যবসা করবে। এই সব কথাই আজকাল সে ভাবে। তবু তার ভয় করে। হয়ত হীরা একদিন মত পরিবর্তন করবে। মেয়েদের মন সে বুঝতে পারে না। সেইজন্যে তার ভয় বেশি। ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। হীরার গায়ে হাত দিতে বড় ইচ্ছে করে। হীরার শরীরটা কত নরম একবার পরীক্ষা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভয় করে যে সুর ও ছন্দ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, তার যদি হঠাৎ সুর পালটায় ?

হঠাৎ কি যেন ভেবে সে ফেডরিককে কাছে ডাকল, মিস্টার, থার্টিন তারিখে আমি একটি মেয়েকে দেখেছি, যার বর্ণনার সঙ্গে তোমার বর্ণনা মেলে, তাকে কিনেছে এখানকারই এক ব্যবসাদার দিগো রিবেলী।

দিগো রিবেলীকে মাইকেল ক'দিন ধরে দেখছে, উড়ন চণ্ডীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজের পত্নীকে খুন করে সে যেন আরও সীরিয়াস হয়ে গেছে। আর যত্র তত্র পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়ে খোঁজে সেই পালিয়ে যাওয়া হীরাকে।

মাইকেল দিগো রিবেলীর নাম বললো এইজন্যে যে তাকে ফেডরিক ধরলে কিছুদিন তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকবে। তাছাড়া ঐ বুড়োকে একটু জব্দ করা উচিত। ব্যাটা কামুক ছুঁচো। সেদিন রাত্রে হীরা ঠিক উচিত মতই শাস্তি দিয়েছে।

মাইকেলের মনে পড়ল সেই সব কথা। হীরাকে দিগো রিবেলী নিয়ে চলে যাবার পর সে ডিউটি খতম হলে ঐ বুড়োর বাড়ির পেছনের জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অন্ধকার গাছপালার পাতার আড়ালে মশার কামড় খেয়ে লুকিয়ে থেকে সে হীরার ঘরের সব ঘটনাই দেখেছিল। হীরা যদি ছুরি তুলে আত্মরক্ষা না করত তাহলে সে পিস্তল চালিয়ে ঐ বুড়োকে শেষ করে দিত।

ফেডরিক শুনে বলল, দিগো রিবেলী নামটা শোনা শোনা। কিন্তু তার দেখা পাব কোথায় ? তারপর বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, সেনাপতি ডি মিলো নিশ্চয় তার ঠিকানা জানে। তারপর বলল, তুমি ঠিক দেখেছো তো পাহারাদার, তারপর একটা ভুল সংবাদ নিয়ে ঝামেলায় পড়ব নাতো! ফেডরিক চলে গেল দুর্গের দিকে দ্রুতগতিতে।

মাইকেল সেই দাসবাজারে অন্যান্য পাহারাদারদের সঙ্গে তখনও দাঁড়িয়ে। মনে তার ভীষণ হাসি পেল। সেই বুড়ো ব্যবসাদার মিষ্টার রিবেলীর মুখটা মনে পড়তে আরও হাসি পেল। ব্যাটা কদিন ধরে যেন হন্যে হয়ে ঘুরছে। হীরার দেখা একবার পেলেই হয়। জলজলে চোখে যেন কাম থৈ থৈ। হীরাকে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এবার কানা বণিক ফেডরিকের সেনাপতি ডি মিলোর পাল্লায় পড়ে জবাব দিতে দিতে প্রাণটা যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দেখতে পেল, ডি মিলো সামরিক পোষাক পরে, দু'কোমরে দুটো পিস্তল গুজে ফের্ডারিকের সঙ্গে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসছে।

তারপর তারা পর্তুগীজ পল্লীর দিকে হাঁটতে লাগল। মাইকেলের মুখ ভরিয়ে আবার হাসি ঝলকে উঠল। তারপর সে খোলা জায়গায় মুখটা উঁচু করে হা হা করে হেসে উঠল।

মাইকেল এমনভাবে কখনও উদ্ধত ভঙ্গি হাসে না, তার হাসি দেখে অন্য পাহারাদার বলল, কি হে, মনে হচ্ছে খুব একটা মজা কিছু পেয়েছ?

মাইকেলের বলতে ইচ্ছে করল ঘটনাটা কিন্তু ঘটনাটা যে বলা যায় না ভেবে চুপ করে রইল।

রোদের তাপ বাড়ছে। গলছে অনেক কিছু। শকুন ঘুরপাক খাচ্ছে। অশ্বত্থ গাছের ছায়ার নিচে নীলমদাররা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু পুড়ছে রোদে খুক্ত মানুষের দল। ধুঁকছে তারা। একটু জলের জন্য জিব বের করে কি যেন বলতে চাইছে। চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। মুখে জল দেওয়া হচ্ছে না, পরিবর্তে নদী থেকে জল তুলে এনে ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জিব বের করা, হাঁ করা প্রাণগুলো এক ফোঁটা জলের জন্যে যেন বেরিয়ে যায় যায়। ছেটানো জলের ফোঁটা চোখে মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে জিব দিয়ে তা তুলে নেবার চেষ্টা করছে।

নীলামদার দাঁত মুখ খিঁচোচ্ছে, তোদের এই রোদে থাকতে কে বলেছে? বিক্রী হয়ে যেতে পারিস না?

ক্রেতা ঘুরছে, তবে তেমন বেশি নয়। তারা আরও যাচাই করছে। দর, দাম করে বাড়তি মাল গোলায় পুরবে, তার জন্যে আরও সময় নিচ্ছে।

ফাদাররা বলছে, খৃষ্টান হও, তাহলে আর এ কষ্ট সহ্য করতে হবে না। পর্তুগীজ সরকার তোমাদের সুখে রাখবে। মিশন তোমাদের সাহায্য দেবে।

মাইকেল হঠাৎ তাকিয়ে দেখল, ডি মিলো ও ফেডরিকের সঙ্গে তর্ক করতে করতে রিবেলী এগিয়ে আসছে। কি তাদের তর্ক বোঝা যায় না। তর্কের ভাষাও বেশ জোরালো।

দিগো রিবেলী বেশ হাত পা নাড়ছে। তার মুখে খড়ের ডগা, চিবুচ্ছে না। মুখে লাগিয়ে কথার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে। আর আশ্চর্যভাবে খড়ের ডগাটা নড়ছে, তবু পড়ছে না।

তারা দুর্গের মধ্যে ঢুকে গেল। মাইকেল আর থাকতে পারল না, অন্য এক সঙ্গীর কাছে ডিউটি জমা দিয়ে সে পা পা করে এগিয়ে গেল।

তারপর সেও ঢুকে পড়ল দুর্গের মধ্যে। তার অনধিকার প্রবেশ নয়, দুর্গের মধ্যেই তার আস্তানা।

মাইকেল এসে দাঁড়াল দুর্গাধ্যক্ষের অফিস ঘরের সামনে। কান রাখল ঘরের মধ্যে।

ফেডরিকের কথাই কানে গেল। লোকটা যেমন ধূর্ত, তেমনি শয়তান। কেমন জাতের দোহাই দিচ্ছে। বলছে, মিষ্টার রিবেলী, আমরা উভয়েই এক দেশের লোক। ইণ্ডিয়ান ওশান পার হয়ে আমরা সবাই এসেছি! আপনি স্বাধীন ব্যবসাদার, আমিও স্বাধীন, তবে একটু নোংরা কাজ করি। দেশের জন্যেই মানুষ ধরে এনে বিক্রী করি। তাদের জোর করে খৃষ্টান করি। কেন করি নিশ্চয় আপনার জানা আছে। দেশের জন্যে আমি যা করি, আপনি তা করেন না। আপনি নিজের জন্যে সব কিছু করেন। তবু আপনাকে কিছু আমাদের বলার নেই। কারণ আপনাদের মত সজ্জন, সম্ভ্রান্ত গৃহীও আমাদের দরকার।

কিন্তু এবার আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে, যে মেয়েটিকে থার্টিন তারিখে কিনেছেন, অবশ্য বলতে পারছি না সেই সম্রাটের হারানো বাঁদী কিনা! তবু তাকে দেখলে আমি বুঝতে পারব সে কিনা!

দিগো রিবেলীর মুখটা আরও যেন অপমানে লাল হয়ে উঠল, মাথা নেড়ে বলল, আমি তো সবই আপনাদের দেখালাম। আমার অন্তঃপুরে যে কটি মেয়ে আছে সকলকেই দেখলেন। আর আমি যে ঘটনার কথা বললাম সেটা বিশ্বাস করছেন না কেন?

বিশ্বাস করছি না এইজন্যে যে, গত এক সপ্তাহ আগে যে মিটিং এই ঘরে হয়েছিল, আপনার কাছে তখন সেই মেয়ে ছিল। আপনি আমাদের আলোচনা শুনেও সহযোগিতা করেন নি।

দিগো রিবেলী রাগত কণ্ঠে বলল, দিস ইজ ভেরি অফেনসিভ! আমি এ ধরণের কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে রাজী নই।

নিশ্চয় রাজী হবেন। ফেডরিকের এক চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। বলল, এ আমাদের সবার ভাগ্য। বাদশাহ যদি সৈন্য নিয়ে অ্যাটাক করেন তাহলে আমাদের এই এত মেহনতে গড়ে তোলা পোটো পিকুনো ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

ডি মিলো এইসময় শান্তকণ্ঠে বলল, ফেডরিক, এটা ঝগড়ার সময় নয়। মিঃ রিবেলী যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তার ওপর আমরা ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

দিগো রিবেলী বলল, কিন্তু আমি তো সবই বললাম কমাণ্ডার। মেয়েটি ফোর্টিন তারিখের সকালে কোথায় যে পালিয়ে গেছে আজও সন্ধান করে পাই নি।

ফেডরিক হঠাৎ হেসে উঠে বলল, হাওয়াতে তাহলে ভেসে গেছে বলুন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলল, আপনি আপনার পর্তুগীজ ওয়াইফকে মার্ডার করলেন কেন ?

দিগো রিবেলী উঠে দাঁড়াল। বলল, বণিক, তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।

ফেডরিকও মারমুখী হয়ে এগিয়ে এল। বলল, ভয় দেখাবেন না। যা সত্য তাই বলছি। হয়ত সেই মেয়েটিকেও সেইরকম ভাবে সরিয়েছেন।

ডি মিলো কেমন যেন ভেবে পাচ্ছিল না কোনদিক দিয়ে এগিয়ে যাবে। তাই চুপ করে থেকে দুজনের তর্ক শুনছিল।

হঠাৎ দিগো রিবেলী উঠে চলে যাচ্ছে দেখে আর থাকতে পারল না, বলল, মিঃ রিবেলী, আপনি চলে গেলে কিন্তু ব্যাপারটার সমাধান হবে না। আপনি বসুন। আলোচনা হওয়া দরকার, সমস্যা আমাদের সবার। আলোচনা না করলে ব্যাপারটার সমাধান হবে না।

দিগো রিবেলী গম্ভীরকণ্ঠে বলল, যা বলার আমি চিঠি মারফৎ পর্তুগীজ সরকারকেই জানাবো। এইভাবে কিছু অশিক্ষিত বোম্বেটেদের সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছে নেই।

ফেডরিকের একটি চোখ হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল কিন্তু ব্যাপারটা খুব নাটকীয় হয়ে উঠবে বলে সামলে নিয়ে সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল, কমাণ্ডার, আমাকে—আমাকে উনি অশিক্ষিত বোম্বেটে বলেছেন কিন্তু ওর ঘরে যে মেয়েছেলের হাট দেখেছি, কোন্ সভ্য দেশের সভ্য মানুষ এইরকম জঘন্য জীবন যাপন করে ?

দিগো রিবেলী আর দাঁড়াল না, রাগে কাঁপতে কাঁপতে কোমরের প্যাণ্ট ঠিক করে নিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ফেডরিক বলল, সেনাপতি, আপনি ওকে চলে যেতে সুযোগ দিলেন ? ওকে বন্দী করা আপনার উচিত ছিল।

ডি মিলো ফেডরিকের কথার উত্তর দিল না। সে ভাবতে লাগল কি যেন ! যদি সেই মেয়েটি সম্রাটের বাঁদী হয়, তাহলে খুব চিন্তা করে এগোতে হবে। দিগো রিবেলীকে এমন ভাবে চটিয়ে কোন কাজ হবে না। তাছাড়া···তাছাড়া মনে হয় সে সত্যি কথাই বলেছে। মেয়েটি তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে। ফেডরিককেও হাতে রাখতে হবে। সে অনেক উপকার করেছে। তারই চেষ্টায় মৃত বাঁদীটিকে পাওয়া গেছে। হয়ত তার কথাই শেষপর্যন্ত ফলবে। অন্য বাঁদীটিকেও পাওয়া যাবে।

তাই বলল, ফেডরিক, তুমি বরং দু'চারদিন এখানে থাকো। মিঃ রিবেলী চলে গেলেও তিনি তো আর হুগলী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন না। তা ছাড়া মেয়েটি যদি এখানে থাকে, যাবে কোথায় ? বরং কিছু গুপ্তচর লাগিয়ে দিই। আর মিঃ রিবেলীর সঙ্গে অন্যভাবে কথা বলি।

ফ্রেডরিক অধীনের মত মাথা হেলিয়ে সায় দিল, তারপর বলল, ঠিক আছে, আপনি যা ভাল হয় করুন। আমিও তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করব।

ফ্রেডরিক বেরিয়ে আসবার আগেই মাইকেল সরে পড়ল।

স্যামুয়েল পরামাণিকের বাড়ী সেদিন একটি ছোটখাট উৎসব ছিল।

মারিয়ার জন্মদিন। মারিয়াও ক্রীতদাসী। সেও একদিন সবার মত জাহাজ বোঝাই হয়ে দাসবাজারে এসেছিল। দক্ষিণ দেশের মেয়ে। ফাদার অ্যামুয়েল তাকে কিনে স্যামুয়েলকে উপহার দিয়েছিল। তাদের গির্জায় খৃষ্টান মতে বিয়ে হয়েছে। তা সেও আজ ক'বছর হয়ে গেল। অনেকগুলি ব্যর্থ ডে তারা পালন করেছে। মারিয়ার দুঃখ, তার একটিও সন্তান হল না। মা না হলে মেরীর মত মাতৃত্বের কথা কি করে বুঝবে? মেরী, আওয়ার লেডি, ঈশ্বরের মত সন্তান গর্ভে ধরেছিলেন বলেই তো তিনি শ্রেষ্ঠা। মারিয়ার দুঃখ অনেক।

আর কালিপদ স্যামুয়েল পরামাণিক নতুন জীবনে মারিয়াকে বার বার সুখী করার চেষ্টা করে।

সেদিন মারিয়ার বার্থডে উৎসবে কয়েকজন ফাদার ও মাইকেলের মত স্যামুয়েলের কজন পর্তুগীজ বন্ধু এসেছিল। আর সব সেই পল্লীর বাসিন্দা। তারাও নিমন্ত্রিত।

ঘরের টেবিলের ওপর বাড়িতে বানানো প্রণকেক ও তার চারপাশে মোম বাতি জ্বলছিল। অতিথিরা গোল হয়ে বসে আছে।

মারিয়াও সেজেছে সুন্দর। তার সঙ্গে হীরাও আরও সুন্দর।

হীরার দিকে অনেকে তাকিয়ে আছে। হীরার পরণে শাড়ী, আর মারিয়ার পরণে বিলিতী কাপড়ের ফিকে নীলচে রঙের লম্বা গাউন। মাটিতে লুটোচ্ছিল গাউন। সে গাউন বাগিয়ে ধরে সবাইকে নিচু হয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিল।

স্যামুয়েলও আজ সেজেছে সুন্দর। সাদারঙের স্যুটে তাকে সাহেব দেখাচ্ছে। যদি গায়ের রঙটা একটু পালটাতে পারত, তাহলে আর স্যামুয়েলের কোন দুঃখ থাকত না। সে হঠাৎ অ্যানাউন্সমেণ্ট করল, মিস হানা আপনাদের একটি পর্তুগীজ সঙ গেয়ে শোনাবে।

হীরা এখানে নাম পরিবর্তন করে হানা হয়েছিল। যখন খৃষ্টানই হবে তখন নামটাও চালু হয়ে যাক না। মাইকেল হীরা নামটা জানত না, হানা বলেই ডাকত। সেই হানা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জিত হয়ে স্যামুয়েলের দিকে তাকিয়ে জিভ ভেঙাল।

স্যামুয়েল দুষ্টুমীর হাসি হেসে আবার ঘোষণা করল, হানা নতুন পর্তুগীজ ভাষা

শিখছে, আপনারা যারা এখানে খাঁটী পর্তুগীজ আছেন তাঁরা দয়া করে হানার উচ্চারণে ভুল ধরবেন না। আবার সকলে হেসে উঠল।

হানা আবার লজ্জায় রাঙা হয়ে চোখের তর্জনী তুলে স্যামুয়েলকে শাসাল। তারপর সে পিয়ানোর দিকে এগিয়ে গেল।

এই সময়ে মাইকেল এসে সেখানে দাঁড়াল।

তখন হানার পর্তুগীজ গান শুরু হয়ে গেছে। গানটি মাইকেলেরই শেখানো। সে সিটি বাজিয়ে যে সুর বার করত সেই সুরে মাইকেলের শেখানো হানার গলার গান। হানা গান গাইছিল কিন্তু সুরের সাথে উচ্চারণটা কেমন যেন মিলছিল না। অথচ গানটি বিখ্যাত একটি লাভ সঙ্গীত।

বিখ্যাত গান বলেই উপস্থিত পর্তুগীজ যুবক যুবতীরা হানার সঙ্গে গলা মেলাল। অনেক কণ্ঠে গানটা যেন সুরে ছন্দে নতুন হয়ে পর্তুগাল থেকে ফিরে এসে সেই ঘন সন্ধ্যার হুগলীর খৃষ্টান পল্লীতে সরব হয়ে উঠল। মাইকেল কিন্তু গলা মেলাল না, সে তখন গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছিল।

বাইরে চাপ চাপ আঁধার জমে উঠেছে। দূরের জিনিসকে কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছে। ঘন গাছগাছালি। এ অঞ্চলে সবার বাগান আছে। যেমন বাগানে আনাজ তরকারী ফলে তেমনি ফুলের গাছও আছে। বাংলা দেশের সেরা ফুল গাঁদা, টগর, বেল, যুঁই, জবা, আকন্দ। তাছাড়া বনফুল। যাদের জন্ম অবৈধ সন্তানের মত, যেখানে সেখানে ফুটে উঠে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তারাও বাহার নিয়ে জেগেছিল।

আর এসেছিল পর্তুগাল থেকে কিছু ফুলের চারা। বিচিত্র ধরনের ফুল। লাল, গোলাপী, বেগুণী, সাদা নানা রঙের। ফাদার দাক্রুজ যে বীজ ছড়িয়ে যায় তারও কিছু কিছু চারা ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিল। তবে এখনও কারো দৃষ্টি কাড়েনি। তবে ফুল হবার আগে দাক্রুজই একটা নাম চালু করেছিল, কৃষ্ণ মাটির দেশে কৃষ্ণবর্ণের মানুষের নামে ফুলের নাম 'কৃষ্ণকলি'। আরও তার এই নাম দেওয়ার কারণ, দাক্রুজ খৃষ্টান ধর্মযাজক হয়েও হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ না পড়ে থাকে নি। হিন্দুর মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত তার মুখস্ত।

শ্রীকৃষ্ণের মত একজন শ্রেষ্ঠ ধার্মিক মানবাত্মার চরিত্র পড়ে সে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তাই ভারতের মানুষকে সে শ্রীকৃষ্ণের মতই মনে করে। সে কোন কথাই কারও সঙ্গে বিশেষ বলে না, তবু তার মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায়, অন্য ধর্মযাজকরা শুনে বলে, তুমি বিশ্বাসঘাতক, এদেশে এসেছ খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে নয়, মানুষের মধ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করার প্রচার কার্য চালাতে।

স্বপ্নিল চোখে শুধু ফাদার দাক্রুজ তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে থাকে, উত্তর দেয় না, শুধু ঠোঁটের একফালি হাসি যেন কি জন্যে তার জেগে ওঠে। কি যেন সে বলতে চায়, কি যেন বলে না। ব্যাণ্ডেল গির্জার মধ্যে আওয়ার লেডির সামনে তাকে সেখানকার ফাদাররা খুব একটা যেতে দেয় না। তাতেও তার কোন দুঃখ নেই।

তার ছোট্ট কুঁড়েঘরে যিনি আছেন, তিনি অন্যরূপে গির্জার উঁচু মঞ্চে সবার উপাসনা নিয়ে পুণ্য, স্নিগ্ধপ্রভা উজ্জ্বল বিমুগ্ধদৃষ্টিতে জেগে থাকুন।

তার ঘরে যিনি আছেন, তিনি কি একান্ত লোকচক্ষুর বাইরে দীনা বলে একটি মাত্র ভক্তের আকুল প্রার্থনায় কান দেবেন না?

দাক্রুজ যেন অন্য এক ভাবের, অন্য এক মানুষের শক্তিতে অন্য জগতের মানুষ। এ মানুষ কোন দেশের বা কোন কালের মনে হয় না।

অত্যাচারী পর্তুগীজদের মাঝে, এমন কি ধর্মের সত্যকে প্রচার করতে যে যে ধর্মযাজকরা এদেশে এসে খৃষ্টান করার জন্যে বহু মানুষের ওপর অত্যাচারেরই ভূমিকা নিয়েছে, সেখানে এই দাক্রুজ কেমন যেন দল ছাড়া। দাক্রুজও এসেছিল মারিয়ার জন্মদিনে। এক পাশে চুপ করে বসেছিল। অন্যান্য ধর্মযাজকের মত খুব একটা কথা বলছিল না।

হীরা প্রগলভা। হীরা উজ্জ্বল মোমবাতির কম্পমান আলোর মত দ্যুতিময়। তার কথার জালে, হাসির মধুর ধ্বনিতে, চোখের মোহময় দৃষ্টি তীক্ষ্ণ আকর্ষণে মারিয়ার জন্মদিন মুখর হয়ে উঠেছিল।

সকলেই জানে মাইকেলের সঙ্গে এই দেশীয় মেয়েটি একদিন ঘর বাঁধবে। সবই প্রস্তুত, শুধু চার্চে গিয়ে শুভকাজটা শেষ করলেই হয়।

যুবকরা সেইসব কথা ভেবে ঈর্ষান্বিত হয়ে হীরার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ছিল। আর চেষ্টা করছিল যদি মাইকেল থেকে মনটা সরিয়ে তাদের কারও দিকে মেয়েটি ঢলে পড়ে।

সেইজন্যে অনেক রঙ্গ তামাশাও চলছিল। রক্ত রঙের বেলুনটা বার বার ফুলে ফুলে উৎসব মুখরিত ঘরে গড়াচ্ছিল।

কেউ বলল, মিস হানা নাইস।

সঙ্গে সঙ্গে হীরা ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখে কটাক্ষ হেনে বলল, কি নাইস? প্রণকেক না আমি?

অন্য একজন বলল, কেক তো খেলেই শেষ হয়ে যায়। তুমি শেষ হবে না। কেকের চেয়েও তুমি উপাদেয়।

হীরা ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। রূপের প্রশস্তি কে না চায়? হীরা চোখের দৃষ্টি হেনে যুবকটিকে মোহিত করে বলল, তাই বুঝি!

আজ একজন বলল, মাইকেল ভাগ্যবান।

জবাব হীরার মুখে তৈরী। সেও জানে কথার যাদু কোন পথ দিয়ে এসে একই আবর্তে ঘোরাফেরা করে। কেন করে? কি চায় এই মানুষেরা? সে সব জানে। তবু তার হাসি, দৃষ্টি এতটুকু ম্লান না হয়ে আরও সরস হল।

মাইকেল যে এসেছে সে দেখেনি। আর মাইকেলও তাকে দেখা দেয়নি। কতকগুলি সুসজ্জিত নারী পুরুষের ভীড়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কি যেন ভাবছিল দূর থেকে দাঁড়িয়ে।

হীরার দিকে সে তাকিয়েছিল। আর ভাবছিল ডি মিলো চতুর্দিকে চর ছড়িয়ে দিয়েছে। এই ভীড়ের মধ্যে কেউ কি ঘাপটি মেরে হীরার দিকে তাকিয়ে নেই? ফেডরিক সেই মেয়েকে নাকি চেনে। ফেডরিক যদি হীরাকে দেখে চিনতে পারে? হীরা যে সেই, এ যেন আর ভুল নয়।

মাইকেলের মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে গেল। সে আর কিছু ভাবতে পারল না। কতক্ষণে উৎসব শেষ হবে, হীরাকে আলাদা করে পাবে সেই কথা ভাবতে ভাবতে তার অসহ্য সময় কাটতে লাগল। তাকে পেলে আজই সন্দেহ ভঞ্জন করে নিতে হবে। সে যদি সত্য কথা বলে, ভাল। হীরা কি সত্যিই তাকে সত্যি কথা বলবে? কে জানে? নারীমন বোঝা মুস্কিল। হীরা যে রকম ভাবে খুশিতে দুলে দুলে ফুলের মত রূপ বিলিয়ে সবার মধ্যে ছোটাছুটি করছে, তাতে তাকে এ সময়ে কোন কথা বললে গুরুত্ব দেবে কিনা সন্দেহ!

কে একটি যুবক তার হাতটা ধরে টানল। তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হীরা এমন মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিল যে আর কোন কথা বলতে সে পারল না। কেমন যেন মদনের রতি সুন্দরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বিবশ কামনা ঘুরে ঘুরে ফিরতে লাগল। আর অভ্যাগতদের জ্বালাতে লাগল। হানা, হানা, হানা।

এক সময়ে মারিয়ার জন্মদিন উৎসব পালিত হল। মোমবাতির অনির্বাণ শিখাগুলি পূর্ণ আয়ু নিয়ে মারিয়ার দীর্ঘ জীবন কামনা করল। ফাদাররা এক সময়ে গির্জার ধর্মসঙ্গীত গেয়ে উঠল। তার সঙ্গে অতিথিরাও যোগ দিল।

●
● ●

মাইকেল এসে দাঁড়াল স্যামুয়েলের বাড়ী ছেড়ে একটি নিমগাছের তলায়।

আকাশে ধীরে ধীরে আলো ফুটছে। মেঘ সরে যাচ্ছে। রাতের ঐশ্বরিক আলো বেরিয়ে আসছে। তবু দূরে দূরে অন্ধকার। কে যেন দূরের ঐ আলপথে একটা কালো কাপড়ের পর্দা ফেলে দিয়েছে।

মাইকেল বরাবরই রাতে বেরোয়। এই নিয়ে দুর্গ পাহারাদারদের সঙ্গে তার কত ঝগড়া। দুর্গে শেষ ঢোকার হুকুম রাত আটটায়। আটটার পর কেউ এলে পাহারাদার কিছুতে খুলে দেয় না কিন্তু মাইকেল স্বতন্ত্র। তবে সে যদি বাইরে বেলেল্লা জীবন যাপন করে আসত, তাহলে হয়ত পাহারাদার খুলত না কিন্তু পাহারাদার জানে মাইকেল কেন যায়।

মাইকেল সারাদিনের ডিউটির পর নদীর ধারে বন্দর ঘাটে বসে থাকে। দেখে সারাদিনের হট্টগোলের পর বন্দর কেমন নিশ্চুপ ও শান্ত।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে মাল খালাস করে জাহাজগুলি, কিম্বা দূর পথে আবার চলে যাবে বলে আলো জ্বেলে নাবিকরা জাহাজ সারাচ্ছে।

কোন কোনদিন সন্ধ্যে থেকেই আকাশে আলো ফোটে। তখন জলের চেহারা

হয় টলায়মান কোন আলোময় সমুদ্রের মত। দূরের সেই ওপার, যা দিনের বেলাতেও ধোঁয়াটে, তা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মাইকেল কোন কোনদিন উঠে চলে যায় ঐ নতুন ধর্ম পাওয়া খৃষ্টান পল্লীতে। এখানে তবু একটা জীবনের ছন্দ দেখতে পায়। নিজেদের জাত ভাইয়ের পল্লীতে ঢুকলে তার যেন গা কেমন ঘুলিয়ে ওঠে।

ঘরে ঘরে হুল্লোড় জীবন। সন্ধ্যে থেকেই বাড়ীতে মিউজিক। নাচের ছন্দে, নেশায় মৌতাতে, মদের সুগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। যেন পর্তুগালের কোন নৈশ পানশালায় সে ঢুকে পড়েছে।

এই সব বাড়ীর মধ্যে কর্তা পর্তুগীজ, কর্ত্রী অধিকাংশ এদেশীয়। নিজের জাতের মেয়েও আছে, তবে খুব কম। এই সব পরিবারে যে সব ছেলেমেয়েরা জন্মেছে, তারাও যেন দুই দেশের রক্তের সংমিশ্রণে রুক্ষ ও কোমলতায় এক নতুন মানুষ হয়েছে।

মা হয়ত এ দেশীয় মানুষ, স্বামীর ভাষা রপ্ত করেছে। বাপ পর্তুগীজ ভাষা ছেড়ে এ দেশের হাবভাবে নিজেকে গড়ে তুলছে।

মাইকেল এই সময় ভাবল, হীরার সাথে বিয়ে হলে তাদের ছেলেমেয়েও কি এই রকম হবে? না, সে ছেলে হলে নিজের মত গড়বে, মেয়ে হলে মায়ের মত।

রাতেও সময় তার অল্প। প্রত্যহ দুর্গে ফিরে তাকে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেই হয়। তারপর শেষরাত থেকেই তার আবার ডিউটি।

তখন বন্দরে এসে পড়ে মানুষ বোঝাই জলযান। অন্ধকার পথেই জলযানগুলি বন্দরে এসে দাঁড়ায়। সেই থেকে শুরু হয় তার পাহারা দেওয়ার কাজ।

দুর্গের মধ্যে আরও থাকে তার মত সহকর্মী। তারা এলে তাকে ডেকে নিয়ে যায়। তার মধ্যে একজন শুধু নতুন বিয়ে করেছে।

রিচার্ড, রিচার্ড পর্তুগীজ পল্লী থেকে আসে।

তার কথা শুনে হাসি পায়, বলে, দোস্ত এ কাজ একদিন ছেড়ে দেব। চুঁচুড়ায় চলে যাব। সেখানে স্বাধীন ব্যবসা করব। নতুন বিবাহিত জীবনে রাতে মিসেসকে ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করে না। সেও ছাড়তে চায় না।

তার কথা শুনে অনেকেই হাসে।

মাইকেল দেখতে পেল স্যামুয়েলের বাড়ী থেকে অনেকেই চলে যাচ্ছে। সেও ছটফট করে উঠল। রাত এগিয়ে চলেছে। একটু বিশ্রাম নিতে হবে। আবার তো জাহাজ ঘাটায় গিয়ে প্রত্যহের ডিউটি। দিগো রিবেলা বেশ জব্দ হয়েছে। ফেডারিকের পাল্লায় পড়ে এবার চৈতন্য হবে।

আলোটা আরো ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। রুটির মত গোল চাঁদটা চষামাটির ওপর আলো ফেলে দুলছে।

মাইকেল গাছটার তলা থেকে একটু সরে এল। মাথাটা গাছের পাতার ছায়া থেকে বের করে অন্য একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াল।

তাকে কেউ দেখতে না পায় এমন করে নিজেকে আড়াল করল।

স্যামুয়েলের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যে যার পথে ছড়িয়ে পড়ছে।

তারা কথা বলতে বলতে চলেছে। অনেকের মুখে হীরার কথা। হীরা নয় হানা। উৎসব মারিয়াকে নিয়ে হয়নি, হয়েছে হীরাকে নিয়ে। তার সঙ্গে নিজের নামও শুনতে পেল মাইকেল।

কেউ যেন বলল, তাকে ঠিক দূরে থেকে চিনতে পারল না। মাইকেল যদি মেয়েটাকে রিফিউজ করে, আমি এনগেজ করতে পারি। সি ইজ এ বিউটিফুল অ্যাণ্ড মোস্ট নাইস উওম্যান।

সঙ্গের সঙ্গী বলল, তুমি হাত ধুয়ে বসে থাকো। মাইকেল ছেড়ে দিচ্চে আর তুমি নিচ্ছ।

বক্তা বলল, আমি প্রপোজ করেছিলাম কিন্তু মেয়েটি বড চালাক। এমন সুন্দর ভাবে কথাটা এড়িয়ে গেল যে কিছুই বলতে পারলাম না।

দুজন পর্তুগীজ যুবক এই আলাপ করতে করতে যাচ্ছিল। তারা বেশ জোরে জোরে কথা বলছিল। কেউ ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে থেকে শোনবার নেই বলেই হয়ত বলছিল। কিন্তু মাইকেল সবই শুনতে পেল।

বাংলাদেশে অনেকদিন থেকে অনেক বাংলাভাষাও তারা রপ্ত করেছে। প্রত্যেক পর্তুগীজ নরনারীই ভাঙা উচ্চারণে কিছু বাংলা বলতে পারে। সুন্দর কথা একটি কানে লাগলেই মুখস্ত করে নেয়। মানে হয়ত সব সময় জানে না। তবে জায়গা অনুযায়ী লাগিয়ে দেয়। তেমনি সেই দুই পর্তুগীজ যুবকের মধ্যে একজন হঠাৎ বাংলা কথাই বলে উঠল।

ছলনাময়ী, রোহস্যময়ী। বলে সে হো হো করে হেসে উঠল। তারা দূরে মিলিয়ে গেল।

আরও অনেকে চলে গেল। ফাদাররাও এক সময়ে গেল। পল্লীবাসীরা যে যার বাড়ীর পথে চলে গেল। মাইকেল তারপর স্যামুয়েলের বাড়ীর দিকে ফিরল।

উৎসব শেষে ভাঙা আসর। ছড়িয়ে আছে কিছু ফুলের অবশিষ্টাংশ। তেলের জোরালো আলোগুলি তখনও জ্বলছে।

মাইকেলকে প্রথম দেখতে পেল মারিয়া। মারিয়ার দেহে তখনও জন্মদিনের সাজ। সে মাইকেলকে দেখেই অভিমানী হল। চিৎকার করে স্বামীকে ডেকে বলল, দেখো, তোমার বন্ধুর এই আসার সময় হল?

কিন্তু আলোতে মাইকেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে যেন কেমন হয়ে গেল। মাইকেল নিজেও জানে না, তার দুর্ভাবনা মুখের ওপর ফুটে উঠেছে।

মারিয়া জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে মাইকেল? অসুখ করেছে? মুখের চেহারা তো ভাল দেখছি না!

সেখানে স্যামুয়েল ও হীরা এসে উপস্থিত হল।

হীরা তখনও আনন্দে খুশি খুশি। সে মাইকেলকে দেখে অচেনার মত ভাণ

করল কিন্তু মাইকেলের সে সব লক্ষ্য ছিল না। সে শুধু হীরার দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, শুনবে ?

হীরা খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে হাল্‌কা স্বরে বলল, বলো।

স্যামুয়েল হঠাৎ বলল, কি হয়েছে মাইকেল তোমার ? মারিয়ার বার্থডে ফেষ্টিভালে এলে না কেন ?

মাইকেলের উত্তর দিতে ইচ্ছে করছিল না। তবু বলল, এসেছি তো ! অনেক লোক ছিল বলে দেখতে পাওনি। হীরার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, বিশেষ কথা, সবার সামনে বলা যাবে না।

হীরা মনে মনে দারুণ অভিমানী হয়েছিল। যাকে উৎসবের মধ্যে কত খুঁজেছে, আর এই উৎসব শেষে আসা। কে চায় এই শেষের ভাঙা আসরে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলতে ? কত লোক তাকে অতিরিক্ত সঙ্গ দিয়ে প্রেম জানাতে এসেছিল, তাদের সে আবর্জনার মত ঠেলে দিয়েছে একজনের জন্যে। যাকে মন প্রাণ নিবেদন করে হৃদয় ভরে রেখেছে। সেই মানুষ এখন মরা মানুষের মত মুখ করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দূর, জীবনটাই যেন কেমন ? মনের সঙ্গে যদি কোন মুহূর্ত মেলে ! তাই সে সেই অভিমানেই মাইকেলকে দূরে ঠেলে দিতে চাইল। বলল, আমি এখন বড় ক্লান্ত। কাল তোমার কথা শুনব।

মাইকেল কোনদিনও হীরার কথার প্রতিবাদ করেনি। শুধু সমর্থন করে গেছে। আর তুলে নিয়েছে যেটুকু নিঃশব্দে পাওয়া যায়। কিন্তু সে আজ বলল, কাল শুনলে চলবে না। কাল হয়ত এসব কথার অর্থও থাকবে না।

হীরা একটু বিস্মিত হল, কেমন যেন সে ভয়ও পেয়ে গেল।

স্যামুয়েল বলল, বেশত হানা, মাইকেল কি বলতে চায় শোনো না ? হয়ত সত্যিই আজ তোমার জানা দরকার।

স্যামুয়েল ওদের ঘর ছেড়ে দিয়ে যেতে চাইল।

কিন্তু হীরা বলল, না না চলো, আমরা বাইরে কোথাও বসে কথাটা শুনি।

হীরা ইচ্ছে করে মাইকেলকে শাস্তি দিতে চাইছিল। সে যেমন আজ জব্দ করেছে সেও করবে, কিন্তু মাইকেলের মুখ, তার কথা, তার হাবভাব সবই যেন তাকে ভয় পাইয়ে দিল। অভিমানের ঢাকনাটা সরে গেল। উৎস মুখ আবার মাইকেলের জন্যে কাতর হয়ে উঠল। তাছাড়া সে ভয় পাচ্ছিল, মাইকেলের দিকে তাকিয়ে। কি এমন সে বলতে পারে, অনুমান করতেও পাচ্ছিল না।

তবে কি মাইকেল আজ নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে ? রূপের মোহ তার চোখ থেকে সরে গিয়ে এখন সে অন্য কথা ভাবছে ? হয়ত সে সেই কথাই বলবে, হানা, এক্সকিউজ মি। না সে সেকথা বললেও হীরা আর নিজেকে রোধ করতে পারবে না। আজ যে মনে মনে অনেক স্বপ্ন জমা হয়েছে। সে স্বপ্ন হঠাৎ ফুৎকারে নিভে যাবে কেন ? মাইকেল তাকে যে সুখ ও সৌভাগ্যের পথ দেখিয়েছে, যে ভালবাসা দিয়ে ইমারত গড়েছে, সে তো রাতের আকাশের মত দুর্বোধ্য কখনও মনে হয় নি !

এখন আর সমুদ্রের এপার ওপার নেই। তুটি মানুষ, তুটি সেই নরনারী। তাদের ভাষা আলাদা, তবু মনে হয়েছে, ব্যবধান যা বাহ্যিক থাক অন্তরের নিচে যে প্রবাহিনী ধারা আছে তার স্রোতে কোন ভেদাভেদ নেই। সেই স্রোতে তারা ভেসেছে। সেই স্রোতেই তারা একদিন ঘর বাঁধবে।

ওরা এগিয়ে চলল অনেকখানি দূরে। খোলা মাঠের ওপর আলো যেন হাসছে। অন্য সময়ে হলে হীরা ছোট্ট মেয়ের মত খোলা মাঠের আলোয় ভাসতে ভাসতে ছুটে বেড়াত। বাতাস বইছে। জোনাকি জ্বলছে। হীরা একটা জায়গা ঠিক করে বসল। তার শরীরে তখনও উৎসবের পোষাক। মাথার খোঁপায় ফুলের স্তবক। মুখে প্রসন্নতার সঙ্গে তুর্ভাবনা। বড় বড় চোখ তুলে বলল, তাড়াতাড়ি তোমার কথা শেষ কর মাইকেল, আমি আর ধৈর্য্য ধরতে পারছি না।

রাত এগিয়ে চলেছে। মাইকেল তবু সময় নিল। কি ভাবে শুরু করবে ভাবতে লাগল। দিগন্তে আলো উৎসবের নিঃশব্দে যাওয়া আসা। সারি সারি অশরীরী গাছের বুক ছুঁয়ে আলোর বিন্দু খেলা করে বেড়াচ্ছে।

গ্রীষ্মকালের মাটি। মাটি ফেটে ফেটে ফালা ফালা কাপড়ের মত দেখাচ্ছে। দূরে দূরে নতুন খড় ছাওয়া পল্লী। এখনও সেই সব খড় ছাওয়া ঘরের জানলা থেকে ভেসে আসছে আলোর শিখা। বাতাসের হা হা চিৎকারে শুকনো পাতা খসে পড়ছে। শিয়াল ডেকে উঠল।

হীরা হঠাৎ ছটফট করে উঠল, কই বলো! তোমরা সাহেবরা বড় সময় নাও!

মাইকেল তবু ভাবছে। হঠাৎ সে গম্ভীর অথচ উদাসকণ্ঠেই বলল, তুমি একটা কথার আমার জবাব দেবে? তুমি সত্যিই আমাকে ভালবাসো?

হীরা হঠাৎ ভাবনাহীন কণ্ঠে হেসে উঠল, এই কথা? তার জন্যে এতো ভনিতার কি ছিল?

আমার কথার এখনও উত্তর পাইনি কিন্তু?

হীরা উত্তর দিল না, কেমন যেন লজ্জা এসে তাকে মাথা নত করিয়ে দিল।

মাইকেল বলল, কি হল?

হীরা এবার সলজ্জ হেসে মাইকেলের দিকে তুষ্টুমীর দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর বলল, তুমি বোকা। তুমি সত্যিই বোঝ না কিছু। আবার তারপর হীরা বলল—তুমি মারিয়ার জন্মদিনে এলে না কেন? আমি তোমায় কত খুঁজেছি!

মাইকেল কিছু না বুঝতে পেরে বলল, আমি তো এসেছিলাম, তুমিই তো আমাকে দেখতে পাওনি।

বারে, দেখতে পাই নি না ছাই। আমার চোখ সর্বদা তোমার জন্যে ঘুরছিল।

ঘুরলে আমাকে দেখতে পেতে।

ও হরি দেখতে পাইনি বলেই বুঝি রাগ হয়েছে?

মাইকেল কি যেন ভাবল, বলল, না, আমি রাগ করিনি। আজ বিশেষ

একটা দুর্ভাবনায় পড়েছি বলে তোমাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসেছি। ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়।

হীরা হঠাৎ ভয় পেয়ে, মাইকেলের কাছে তাড়াতাড়ি সরে এল।

মাইকেল বলল ভয়ের কিছু নেই। তুমি যদি আমার কথার ঠিক ঠিক উত্তর দাও তাহলে পরে বাকী ব্যবস্থার একটা কিছু করা যাবে।

হীরা বড় বড় চোখে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, বলো।

তুমি কি সেই মেয়ে, যে দিল্লীর বাদশাহের হারেম থেকে পালিয়ে এসেছে?

হীরা সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে থর থর করে কেঁপে উঠল।

মাইকেল বলল, আমার কাছে লুকিও না হানা। যদি সত্যিই তুমি সেই হও তাহলে আমাকে বলো। হয়ত এখনও সময় আছে তোমাকে সরাতে পারব। আর একদিন দেরী হলে ডি মিলোর চর চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে, ঠিক ধরে ফেলবে। তাছাড়া সেই কানা ফেডরিক, সে আরও ধূর্ত। সেও ঘুরছে, তার জাহাজে নাকি মেয়েটি এসেছে, মেয়েটিকে দেখলে সে ঠিক চিনে ফেলবে।

হঠাৎ হীরার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল. কান্না ভরা কণ্ঠে বলল, মাইকেল তুমি, কি জানলে তোমাদের জাতির স্বার্থের জন্যে আমাকে ধরিয়ে দেবে?

মাইকেল কি যেন ভাবল, তারপর ম্লান হাসল, বলল, হয়ত দেশের জন্যে তাই করা উচিত। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—কিন্তু তা আমি পারব না। তাড়াতাড়ি বলো, রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। আবার আমাকে ফোর্টে ফিরতে হবে।

হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে যে বেগম হারেম থেকে পালিয়ে এসেছিল।

মাইকেল চমকে উঠল না, শুধু কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল।

হীরার চোখে জল, বলল, তুমি আমাকে ধরিয়ে দাও মাইকেল! হীরা এবার ডুকরে কেঁদে উঠল।

মাইকেল ভাবতে লাগল, তার অনুমান সত্যে পরিণত হয়েছে বলে ভাবল না, ভাবতে লাগল এবার সে কি করবে? তারপর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বলল, তুমি বার বার ও কথা বলছ কেন হানা? তোমাকে ধরিয়ে দেব বলে কি ছুটে এসেছি। আমি পর্তুগীজ, দেশের স্বার্থ আমার দেখা উচিত, তবু তোমাকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে আমার কর্তব্য করতে পারব না। এখন আমার প্রথম কর্তব্য হবে তোমাকে এখান থেকে সরানো, কি করে সরাবো তাই ভাবছি।

হীরা চোখের জল মুছল, মৃদুকণ্ঠে বলল, আমাকে সরাতে হবে না মাইকেল। আমি ধরাই দেব। এতটা ভয়ঙ্কর হবে আমি ভাবিনি। বাদশাহের হারেমে আছে হাজার হাজার ক্রীতদাসী, দু'একটি গেলে তাঁর কি ক্ষতি? তাই হুগলীতে পর্তুগীজ উপনিবেশে ছুটে এসেছিলাম। এসেছিলাম দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি পাব বলে। কিন্তু মুক্তি তো মিলল না, পরিবর্তে বিরাট এক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম। আজ তোমাদের সমস্ত ভাগ্য নির্ভর করছে আমাকে ধরিয়ে দেওয়ার ওপর। এতগুলি মানুষের সর্বনাশ করে নিজে বাঁচব সে রকম মেয়ে আমি নই।

জুলেখার মৃতদেহ যখন পর্তুগীজরা উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে, তখন থেকেই বুঝেছি আমাকেও একদিন ধরা দিতে হবে। কিন্তু আমি কি অন্যায় করেছি? এই পৃথিবীতে বাঁচবার অধিকার কি আমার নেই? হীরার চোখ দিয়ে আবার জল ঝরতে লাগল। তার চোখের ওপর ভেসে উঠল সেই বাদশাহী অন্তঃপুর থেকে হুগলীতে এসে পৌছনো পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা।

জুলেখা ও সে।

রত্নখচিত অন্তঃপুরের দেওয়াল, জাফরী কাটা জানলা, ছোট ছোট ছিদ্রের ভেতর দিয়ে কি জৌলুষের ছড়াছড়ি সেই হারেমে! সোনার পাতে মোড়া সব দিক। বিলাস আর বৈভব দিয়ে সবার দিনরাত্রি মোড়া। এই হারেমে বসেই একদিন দেখেছে হীরা, বাদশাহ বদল। সম্রাট জাহাঙ্গীর মারা গেলেন। তারপর প্রাসাদ ঘিরে নেমে এল শুধু রক্ত তাণ্ডব। সম্রাট শাহজাহান তখন বহু বহু দূরে। হীরা হারেমেই ছিল, তখন বয়স কম বলে বাচ্চামহলে বড় হচ্ছিল। একদিন হঠাৎ খানা বন্ধ হয়ে গেল।

খানা বন্ধ হল কেন? প্রত্যহের প্রতিটি নিয়ম হঠাৎ ভেঙে যেতে হীরা বুঝতে পারল, প্রাসাদে কিছু হয়েছে। অনেক নিয়মই কদিন ধরে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে রইল। হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল।

নতুন সম্রাট সিংহাসনে বসলেন। আবার প্রাসাদের চতুর্দিকে আনন্দের বন্যা বইতে লাগল। কালো পর্দা সরে গেল। নতুন নতুন মানুষে অন্তঃপুর ভরে গেল। হীরাও অন্য জায়গা থেকে এসে নতুন কাজে বহাল হল। নতুন সম্রাজ্ঞীর খিদমত খাটবার জন্যে অনেকগুলি বাঁদী তার মধ্যে হীরা একজন।

নতুন সম্রাজ্ঞী মমতাজমহল মানুষ হিসাবে খারাপ নয়, কিন্তু অধীনার ওপর মমতাহীন। তারপর দেখতে দেখতে অনেকদিন কাটল।

হীরার শরীরে যৌবন এল কিন্তু সে বাঁদী। আর দেখলো এখানে বাঁদীদের জীবন কেমন। আর সে জানল সে ক্রীতদাসী। মুখ থুবড়ে এখানে পড়ে থাকা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

বাঁদীদের জীবন এখানে এই বিলাসী অন্তঃপুরে শুধু পাশে থাকবার জন্যে। উঠতে বসতে গঞ্জনা, অত্যাচার, কোন মুক্তি নেই। আর দেখল চোখের সামনে অন্তঃপুরে মেয়েদের জীবন। বাদশাহ একজনই পুরুষ অন্তঃপুরে আসেন। তাঁকে খুশি রাখার জন্যে সম্রাজ্ঞীরও চেষ্টার ত্রুটি নেই।

খোজারা সঙ্গীন উঁচিয়ে শ্যেনদৃষ্টি মেলে পাহারা দিয়ে চলেছে। বাঁদীদের কোন

বেয়াদপি যেন ক্ষমার যোগ্য নয়। অথচ কি এক জঘন্য জীবন চলে বেগম মহলে। নতুন নতুন রূপসী কোত্থেকে যেন আমদানী হয়, আর তাদের নিয়ে লোফালুফি খেলা চলে। মমতাজ বেগমও স্বামীর সুখের জন্যে বিলাসের উপকরণ এগিয়ে দেন। তবু কড়া নিয়ম।

হীরার যেন হাঁফ ধরতে লাগল। ভয় হল, নিজের শরীরে তখন দিন দিন রূপের জৌলুস খুলছে। মেয়েরাও এখানে সরাব পান করে মাতাল হয়। রাত্রি হলে অন্তঃপুরে যেন কি দানবীয় উল্লাস জেগে ওঠে। যে মেয়েটিকে নাচবার জন্যে হুকুম করা হয় সে নেচেই চলে। পা ধরে এলেও সে থামতে পারে না।

হারার চোখ ফেটে জল আসে। শুনেছিল তাকে নাকি বাদশাহ্ সিপাই বঙ্গদেশ থেকে নিয়ে এসেছিল। ছোটবেলা থেকেই তার শরীরটা সুন্দর ছিল। তার বাড়ীঘর কোথায় আজ আর তা মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, তার সব ছিল, তারা একটি গ্রামে থাকত বাবা বাইরে যেন কোথায় কাজ করত। মা কেবলই বকত, ছেলেদের মত বাইরে বাইরে বেশী ঘুরবি না।

স্বপ্নের মতই সেই সব স্মৃতি মনে পড়ে। মনে পড়ে না মায়ের মুখটা। ছোট একটা ভাই ছিল সে খুব দুষ্টু। আর গোয়ালে দুটি গরু ছিল। সে মার কাছে বকুনি খেয়ে ঘরের বাইরে পলাশ গাছটার কাছে দাঁড়ালে, দড়িতে বাধা খোলা জায়গায় ঘাস খেতে খেতে তাদের মঙ্গলা সরে আসত। তারপর মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে আদর নিতে চাইত। সে কখনও রাগ করে বলত, মঙ্গলা জ্বালাসনি বলছি যা! মঙ্গলা সরে না গেলে সে চড় কষিয়ে দিত, তারপর আবার কি ভেবে তাকে কাছে টেনে নিত।

এই সব স্মৃতিই এখন মনে পড়ে। যদি একবার সেই বাড়ীটা কোথায় জানতে পারত? জানতে পারলেই কি হীরাকে তারা মনে রেখেছে? তারা ভেবেছে, হীরা মরে গেছে, কিম্বা···। তাকে যে বাদশাহ সিপাই ধরে নিয়ে গেছে অনেকে জানত।

একদিন দুপুর বেলা একা একা পুকুর ঘাটে গিয়ে জলে মাছ ঘোরা দেখছিল।

আকাশ থমথমে ছিল। দুপুরের ঝিমুনি ছিল গ্রামের মধ্যে। রোদের তাপ ছড়িয়ে ছড়িয়ে ওপরে উঠছিল। ঘুঘু ডাকছিল কোথায় যেন? হঠাৎ কেমন যেন মাটির বুকে দুম দুম শব্দ হল।

পুকুরের পাশেই বড় গঞ্জে যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে কতকগুলি ঘোড়াসওয়ারকে ছুটে আসতে দেখল। ধূলো উড়ছে ঘোড়ার খুরের সাথে। হঠাৎ ঘোড়সওয়াররা থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে একটা খানা লাফ দিয়ে পার হয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। তারপর আর কোন কথা বলতে না দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। ঘোড়ার শব্দে অনেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে তুলে নিতে দেখল কিন্তু প্রতিবাদ করে কি শেষকালে প্রাণ হারাবে? ঘোড়সওয়ারদের সবার কোষবদ্ধে তরোয়াল ছিল।

গ্রামের লোকেরা কি বাড়ীতে খবর দেয় নি? ঘোড়সওয়াররা কারা, তাও

তাদের অজানা ছিল না। বাদশাহ সৈন্যদের পোষাকেই তা প্রমাণ হয়েছিল। সে বন্দিনী, এইটুকু আগ্রায় এসে সে বুঝেছিল। বন্দী সে আজও কিন্তু মুক্তি কি পাওয়া যায় না? হঠাৎ কানে গেল ক্রীতদাসদের মুক্তি দিচ্ছে হুগলীর পর্তুগীজরা।

মমতাজ বেগমের বাঁদী ছিল সতেরজন। তার মধ্যে জুলেখাও একজন। জুলেখার সঙ্গে হীরার ভাব ছিল। জুলেখাও মাঝে মাঝে বলত, হারা পালাবি এখান থেকে? না পালালে একদিন সম্রাটের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিতে হবে।

পালাব কেমন করে? হীরা ভয়ে ভয়ে পাঁচিল তোলা অন্তঃপুরের দিকে চাইত।

জুলেখার কিন্তু আরও সাহস ছিল, সে বলত, অমন তাকিয়ে দেখছিস কি, পালাতে গেলে পাঁচিলও ভাঙতে হবে। তুই রাজী থাকিস তো বল্ তাহলে একটা ব্যবস্থা করি। আমরা পালিয়ে গিয়ে সেই হুগলীতে উঠব। তারপর খৃষ্টান হতে পারলেই মুক্তি পেয়ে যাব।

হীরার শুনে খুব ভাল লাগত। কিন্তু এই আগ্রা থেকে সেই হুগলী, কোথায় তাও জানে না। এ কি সম্ভব? শুধু শুধু অবাস্তব চিন্তা।

জুলেখা শুনে বলত, তোকে ওসব ভাবতে হবে না। তুই রাজী হলেই সব ভার আমার। আমি তোকে যা যা বলব করবি, তাহলে ঠিক গিয়ে হুগলীতে পৌঁছব।

তারপর একদিন সেই মুহূর্ত এল। জুলেখা দিনের বেলা এসে চুপি চুপি বলল, হীরা, তোর গয়নাগুলো দে, আজ রাত্রে পালানোর ব্যবস্থা করেছি।

বাঁদীদের কিছু কিছু গয়না রাজসরকার থেকে দেওয়া হয়। কেউ সব পরে ঝমঝমিয়ে বেড়ায়, কেউ অল্প পরে আলাদা জায়গায় সরিয়ে রাখে। এসব দিকে মনিবদের লক্ষ্য থাকে না। হারাও তার আলাদা বাক্সে রেখে দিয়েছিল। সেই গয়না সে জুলেখার হাতে তুলে দিল। তারপর চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, এখানে দেয়ালেরও কান থাকে, কিরে ব্যাপার কি, আজ রাত্রেই?

জুলেখা তখন আরও চাপাস্বরে বলল; আস্তে, এখন কিছু জানতে চাস না, তবে রাত্রি বেলাতেই সব বলব। এখন গয়নাগুলি তাড়াতাড়ি গছিয়ে দিয়ে আসি। এই বলে জুলেখা উত্তেজনা দমন করতে করতে ওড়নার মধ্যে লুকিয়ে গয়নাগুলি নিয়ে চলে গেল।

আবার তার সঙ্গে জুলেখার দেখা হল, জুলেখা তাকেই খুঁজছিল, দেখা হতেই বলল, থাকিস কোথায়? খুঁজে খুঁজে মরছি, আজ রাতে নয়, ঠিক কাল সন্ধেবেলা এখান থেকে সরে পড়ব। যখন খোজাদের রাতের ডিউটি বদল হবে ঠিক সেই সময়ে। কার সঙ্গে কেমন করে সে অনেক কথা।

হীরা বড় বড় চোখ করে জুলেখার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর বলল, সত্যি, কিন্তু কেমন করে রে বলবি তো!

জুলেখা কেমন যেন কৃতিত্বের চোখে হাসল, বলল—এক আতর বেচনেওয়ালী। দু'বেলা হারেমে আতর বেচতে আসে, সে আমাদের প্রাসাদ থেকে বার করে দেবে। রাজী কি হয়? শেষে তোর আমার দুজনের গয়না দিয়েছি, তারপর অনেক করে

রাজী করিয়েছি। খোজাদের ডিউটি বদলের আগে আতর বেচতে আসবে, তারপর যাবার সময়ে আমাদের নিয়ে বেরিয়ে যাবে। তখন নতুন খোজা পাহারায় থাকবে, সে বুঝবে এরা সকলে আতর বেচতে এসেছিল। সেই শেখ ওমদাদ আলির ঘরবালী আমাদের জন্যে দুটো বোরখাও আনবে।

হীরা সব শুনে যেন কেমন হয়ে গেল। সে বিশ্বাসই করতে পারল না তারা একদিন মুক্তি পাবে। সারাদিন ধরে ভয়ে তার বুকটাও কাঁপতে লাগল। যদি ধরা পড়ে যায়? ধরা পড়ে গেলে কোন ক্ষমা নেই। মুঘল রাজ কানুনে ঘাতকের খড়্গ দেহ দ্বিখণ্ডিত করবে। সে ভয়ে ভয়ে সঙ্গে নিল একটি বিষ ভর্তি আংটি। যদি ধরা পড়ে; শাস্তি পাবার আগে সে পৃথিবী থেকে সরে যাবে। ঐ নির্মম ঘাতকের কাছে গিয়ে গলা বাড়িয়ে দেবার আগে এ মৃত্যু অনেক ভাল। তবু জুলেখাকে বলতে পারল না, এই এত ঝুকি নিয়ে নাই বা গেলাম?

মুক্তি, মুক্তি সেও কি চায় না? যদি শেষ পর্যন্ত গিয়ে হুগলীতে পৌছোয়, আর যদি তারা খৃষ্টান হয়ে ওখানেই ঘর বাঁধতে পারে। জুলেখার চেষ্টা দেখে তার যেন কেমন বিশ্বাস হয়েছিল তারা ঠিক একদিন হুগলীতে গিয়ে পৌছবে। তবু তার পূর্ণ সাহস আসে নি। এসেছে অনেক পরে। সারাদিন চরম উত্তেজনার মধ্যে দিন যাবার পর সন্ধ্যেবেলা জুলেখা এসে বলল, কিরে তুই তৈরি!

তৈরি হবার কি আছে? শরীরে একই ধরনের দুজনের সালোয়ার ও কামিজ। জুলেখা তাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো এক গলি পথের মধ্যে।

সে জায়গাটায় অন্তঃপুরের অফুরন্ত আলোর ছিটে ফোটাও আসেনি। শুধু শোনা যাচ্ছিল হামাম ঘরের জল পড়ার শব্দ। জল গড়াচ্ছে নালি দিয়ে। সুগন্ধি ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

একটা পাঁচিলের ব্যবধান। ওপাশে গোলাপ বাগ থেকে মৌমাছি ভেসে আসছে। কে যেন নারীকণ্ঠে খিল খিল করে হেসে উঠল। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হল না।

গাঢ় আঁধার সেই গলি পথের মধ্যে হঠাৎ সেই আতর বেচনেওয়ালীর দেখা পাওয়া গেল। ভুর ভুর করছে তার গায়ে আতরের গন্ধ। কিন্তু বোরখায় ঢাকা শরীর। সে এসেই ঝটিতি বলল, তাড়াতাড়ি তোমরা বোরখা দিয়ে ঢেকে নাও।

দুটো বোরখা বাড়িয়ে দিল। দিলো আরও দুটি ঝোলা। সম্ভবত তার মধ্যে আতরের শিশি ছিল কয়েক ডজন। দিয়ে বলল, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে আমার মেয়ে। তারপর বোরখা ঢাকা তিনটে মূর্তি অন্তঃপুরের বড় দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

খোজা প্রহরী মুখ তুলে জিজ্ঞাসাও করল না, শুধু রসিকতা করে বলল, কি হে আতর বেচনেওয়ালীরা, মুখগুলো একবার দেখাও না! কিন্তু তারা সরে এসে মুখগুলো দেখলও না বা কোন সন্দেহ করল না।

শুধু আতর বেচনেওয়ালী সুর করে বলল, গরীব মানুষ, তোমরা বাদসাহের ঘরের বড় মানুষ। তোমরা কি দেখবে বাবা আমাদের মুখ।

খোজারা হেসে উঠল হ্য হ্য করে। তারপর আর বাধা নেই। বড় ফটক পার হতেও দেরী হল না। অনেক লোক, যে যার নিজের কাজে যাচ্ছে। ফটকের মুখে সান্ত্রী পাহারাদার। বাইরে তু'মুখো কামান।

আতর বেচনেওয়ালী বেশ নিশ্চিন্ত মনে তার তুই বেটিকে নিয়ে আগ্রা দুর্গ ছেড়ে যমুনার তীর ধরল। তু হাজারী, তিন হাজারী ঘোড়সওয়াররা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

হাওয়া বইছে। এ পাশটায় চাপ চাপ অন্ধকার। যমুনার জলে জোয়ার। নীল জলে যেন আঁধারের ছায়া পড়ে কালো দেখাচ্ছে। থমথমে আকাশ। তু'পাশে সারি সারি ঝাউগাছ মাথা দোলাচ্ছে। মাঝখান দিয়ে পথ। সে পথ কোথায় গেছে কে জানে? থমথমে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে ভর্তি আকাশের দূর দূর উজানে যেন রাগ করে সরে থাকা তু একটি তারা।

হঠাৎ আতর বেচনেওয়ালী মুখের সামনে থেকে বোরখার ঢাকনা সরিয়ে বলল, এবার বাপু তোমরা যেদিকে খুশি যাও, আমি আমার কথা রেখেছি।

জুলেখা হীরার হাত চেপে ধরে থমকে দাঁড়াল। মাথার ওপর আকাশ। মুক্ত তারা। এবার যেদিকে খুশি যেতে পারে। কিন্তু কোথায় যাবে, কেমন করে যাবে তারা ভেবে পেল না। হুগলী এখান থেকে কতদূর কে জানে? তারা একটি বড গাছের পেছনে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়েছিল।

সেই আতর বেচনেওয়ালীর মুখটি দেখা যাচ্ছিল। মধ্যবয়সী রমণী। আগ্রার চকবাজার থেকেই রোজ হারেমে আতর বেচতে আসে। তার আতর নাকি খুব খুসবাই। সে আবার বলল, তোমরা কোথায় যাবে যাও না। আর এখানে দাঁড়িয়ে কি শেষকালে বিপদে পড়বে? আমিও কাজটা করে যে খুব ভাল করলুম না এখন বুঝতে পারছি। সম্রাজ্ঞী জানতে পারলে আমার গর্দান নেবে।

জুলেখা হঠাৎ নিজের বোরখাটা খুলে দিয়ে হীরাকে বোরখাটা খুলে দিতে বললো। তারপর তারা বিপরীত মুখো হয়ে চলতে লাগল।

পথ জানা নেই। অন্ধকার। তবু যেতে হবে। তবে মানুষ-চলা পথে তারা গেল না, যে পথ দিয়ে মানুষ যায় না সেই দুর্গম পথের দিকে পা বাড়াল। যেতেই হবে সেই হুগলী। এতটা যখন সফল হয়েছে বাকীটা কি হবে না? আবার এদিকে ধরা পড়বার ভয়। বুকে দারুণ উত্তেজনা। বুকটা ভয়ে টিপ টিপ করছে। হীরাই কেমন যেন ভয়ে পেছিয়ে পড়তে লাগল, আর জুলেখা তাকে ধরে নিয়ে এগোতে লাগল।

তু'দিন তু-রাত্রি তুটি মেয়ে চড়াই উৎরাই পথ বেয়ে গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। তারা বিশেষ করে নদী পথের পাশ দিয়ে এগোল, উদ্দেশ্য যদি কোন পর্তুগীজ দস্যুবণিকের জাহাজ মেলে তার ওপর উঠে বসবে। তারপর আর হুগলী পৌঁছতে অসুবিধা হবে না। আর লোকালয়ের দিকে যায় নি ধরা পড়বার ভয়ে। তারা অনাহারে থেকেছে তবু ক্লান্তি আসে নি। মনে মুক্তির আনন্দ। মাঝে মাঝে নদীর জল দিয়ে তৃষ্ণা মিটিয়েছে আর পেলে গাছের ফল তাও অনেক সময়ে খায় নি।

তারপর হঠাৎ একদিন দুজনে চলতে চলতে এক পর্তুগীজ দস্যুদের সামনে পড়ে গেল। হীরা তবু পালিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারল। কিন্তু জুলেখা পারল না। জুলেখার সম্ভ্রম নষ্ট করল একটি এক চোখ কানা পর্তুগীজ দস্যু তারপর অবশ্য জুলেখা পালিয়েছিল।

জুলেখা ও হীরা দুজনে আবার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল কিন্তু জুলে- কেমন যেন আর সহজ মনে চলতে পারল না। কান্নায় তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। বার বার বলল, হীরা, মেয়েদের যেটুকু মূল্যবান, তা আমার খোয়া গেছে। আমার আর হুগলীতে গিয়ে কি হবে? তুই যা, আমি আর সেখানে যাব না।

হীরা কত করে বোঝাল, তোর দোষ কি? তুই তো স্বেচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিস্‌নি! জুলেখা, তুই যদি এমন করিস তাহলে আর আমারও কোথাও যাওয়া হবে না। তোর সাহসেই তো আমরা এতদূর এগিয়ে এসেছি।

সেদিনের রাত্রি নেমে এল। এ পাশটায় জঙ্গল খুবই কম। একটা নিরাপদ জায়গা দেখতে গিয়ে তারা পেল একটি গুহার মত।

সেই গুহার মধ্যে তারা রাতটা কাটাল। তখন তাদের আর কোন হিংস্র পশুকেও ভয় ছিল না। দুজনে পাশাপাশি সেই গুহার মধ্যে শুয়েছিল। জুলেখা কাঁদছিল, তার কান্না একবারও বন্ধ হয়নি।

হীরা ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ যখন তার ঘুম ভাঙল, দেখল গুহার মধ্যে দিনের আলো ঢুকছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে গিয়ে দেখতে পেল পাশে শুয়ে জুলেখা কিন্তু কেমন যেন অসহায়ের মত পড়ে আছে। হীরা ডাকতে গিয়ে গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠল। হিমশীতল দেহে প্রাণ নেই। জুলেখা চলে গেছে মুক্তির পরপারে। সে আছড়ে পড়ল জুলেখার মৃতদেহের ওপর। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। সঙ্গীর জন্যে শোক করল। হঠাৎ নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, তার সেই বিষভর্তি আংটিটি হাত থেকে খুলে নিয়ে জুলেখা আত্মহত্যা করেছে। জুলেখা এমনিভাবে মরে যাবে সে একবারও ভাবেনি। তার উৎসাহেই একদিন হীরা সম্রাটের হারেম ছেড়েছিল। সে চলে যেতে তার মনে হয়েছিল, আর এগিয়ে কি হবে? তার চেয়ে আবার সেই আগ্রাতে ফিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করাই ভাল।

কিন্তু মুক্তির নেশায় মানুষ যে সব ভুলে যায় পরের ঘটনাই তার প্রমাণ।

হীরা চুপ করতে মাইকেল বলল, সকালের সব ঘটনা। দিগো রিবেলীর নাম সে বলে দিয়েছে শুধু সেনাপতি ও ফেডরিকের মন ঐদিকে ঘুরিয়ে রাখবার জন্যে। তারপর বলল, যাক তুমি যখন আমার কাছে সব বললে এবার আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দাও, দেখি আমি কি করতে পারি?

হীরা বড় বড় প্রসাধনচর্চিত কালো চোখে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মাইকেলকে খুব ভাল লাগল।

মাইকেল আবার বলল, এসব কথা আর কাউকে বলো না। এমন কি স্যামুয়েলও যাতে জানতে না পারে সেই চেষ্টা করবে। ওরা এ দেশের নতুন খৃষ্টান। খৃষ্টানদের

সাহায্য করবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত। এ সংবাদ যোগাড় করতে পারলে এক মুহূর্ত দেরি করবে না, ছুটে গিয়ে খবরটা পৌছে দিয়ে আসবে কমাণ্ডারের কাছে।

হীরা অসহায়কণ্ঠে ম্লান হেসে বলল, মাইকেল আমি আর কিছু ভাবতে পাচ্ছি না। তুমি যা হয় কর। যদি আমাকে আবার সম্রাটের হাতে তুলে দিলে তোমাদের মঙ্গল হয় তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই।

আলো আরও ছড়িয়ে পড়ল। খোলা মাঠ যেন আলোর গয়না পরে হাসতে লাগল।

রাত আরও গভীর হয়ে এল। আর কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু বাতাস হা হা শব্দ করতে করতে গাছের পাতায় ঝাপটা দিয়ে চলে গেল। শিয়াল ডেকে উঠল পাশ দিয়ে। মাইকেল উঠে দাঁড়াল, হীরাও। তারপর তারা এগিয়ে চলল নিঃশব্দে স্যামুয়েলের বাড়ীর দিকে।

স্যামুয়েলের সঙ্গে দেখা হল, সে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, তারপর পরিহাসকণ্ঠে বলল, লাভ অ্যাফেয়ার্স, আমি একটা ঘর ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম মাইকেল।

হীরা এই রসিকতায় যোগ দিল না সে পাশ দিয়ে অন্যত্র চলে গেল।

মাইকেল শুধু স্যামুয়েলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

তারপর সেও গুড নাইট বলে বিদায় জানিয়ে পথে এসে নামল।

মাইকেল ভাবতে ভাবতেই চলল পথটা। হীরাকে বাঁচাতে হবে। পর্তুগীজ সরকারের হাতে তুলে দিয়ে তার জীবন নষ্ট করলে হবে না। তার জীবন নষ্ট হলে সেও আঘাত পাবে। কিন্তু এমন কেন হল? জীবনে যদি বা এদেশে মিলল একটি মনের মত মেয়ে! হীরা'যে তাকে ভালবাসে, আজ প্রমাণ হয়ে গেছে। ওর রূপ, ওর যৌবন, ওর মন সব সে তাকে দিয়েছে। সে বলল, সে আর ভাবতে পারছে না। কিন্তু সেই বা এই ভার নিয়ে কি করে এগোবে? তাকে জাতির চোখে, দেশের চোখে বিশ্বাসঘাতক হতে হবে। মাইকেলের চোখ দুটো কেমন যেন কড়্মড়্ করতে লাগল। এক ভয়াবহ সমস্যায় তার মন আছন্ন হয়ে গেল।

দিগো রিবেলী, ডি মিলো, ফেডরিক তিনজনে খুঁজছে সেই পলাতক মেয়েকে। এই অবস্থায় থাকলে একদিন ঠিক তারা খুঁজে পাবে। হয়ত স্যামুয়েল সন্দেহ করে দুর্গাধ্যক্ষর কাছে গিয়ে বলে আসবে। মাইকেল আবার ছটফট করে উঠল। পথ চলতে গিয়ে চেনা পথেই ক'বার হোঁচট খেল।

কিন্তু পরের দিন সকালে আশ্চর্য ভাবে সব কিছু বদলে গেল। ভাবনা যেন আর থাকল না।

প্রত্যহের মত হুগলী বন্দরের কাজ শুরু হচ্ছিল। দাসবাজার জেগে উঠেছে। মাইকেল সেই একই ভাবে অশ্বত্থ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

ধৃত মানুষেরা চিৎকার করছে। মেয়েরা হাসছে। যুবতীরা যৌবনের ভারে

চোখে কটাক্ষ টানছে। ক্রেতা ঘুরছে, শকুন নেড়া গাছের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নিলামদার চিৎকার করছে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভয়ে কাঁপছে। দস্যুবণিকের চাবুক ঘুরছে। রক্তে দাস মানুষের শরীর ভেসে যাচ্ছে। ক্ষত হাতের ফুটো দিয়ে পুঁজ গড়াচ্ছে।

ভাগীরথীর জলে জোয়ার। নৌকা, বজরা, পানসি, দুলছে। মাল কেনা বেচা চলছে। হঠাৎ সেই হুগলী বন্দরে খবর এল, মুঘল সম্রাজ্ঞী মমতাজ মারা গেছেন। খবর এনেছে অন্য একটি পর্তুগীজ সর্দার। ৭ই জুন রাত্রে সম্রাট যখন বুরহানপুরে, সম্রাজ্ঞী সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেছেন। খবরটা ঠিক কিনা এইটুকু জানতে শুধু কয়েক ঘণ্টা সব কিছু চুপ হয়ে থাকল। তারপর খবর যখন সত্যি বলে প্রমাণিত হল, সেই হুগলীর পর্তুগীজ উপনিবেশে উৎসব লেগে গেল। বড় দিনের আনন্দের মত। এক সর্বনাশ থেকে বেঁচে সবাই খুশি হয়ে উঠল।

বাদশাহের নির্মম ঘোষণায় সকলেই উদ্বিগ্ন ছিল। একটি বাঁদীর মৃতদেহ পৌঁছে গেছে কিন্তু দ্বিতীয় বাঁদীটিকে পাঠানো হয়নি। বাদশাহের দ্বিতীয় পত্রও আসেনি। ডি মিলোর চিঠি নিশ্চয় পেয়েছেন। সময় চেয়ে ডি মিলো চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু সময় দিয়ে উত্তর আসেনি বা কোন চিঠি। তাই সকলেই আশা করেছিল, হয়ত সুবাদার যে কোন মুহূর্তে হুগলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এদিকে ফেডরিক খুঁজে চলেছে বাঁদীকে। তার জাহাজ বন্দরে নোঙর করা আছে। ডি মিলো চিন্তায় ক্লিষ্ট।

দিগো রিবেলীকে আর ঘাঁটাতে সাহস করেনি। তাকে অন্যভাবে জিজ্ঞেস করবার ফন্দি খুঁজছে ডি মিলো। নিজের জাত ভাইকে চটিয়ে কোন লাভ নেই। সেই মেয়েটি যদি তার কাছে থাকত না হয় কথা ছিল। তা যখন নেই তখন জল ঘোলা করে লাভ কি ?

এই সময়ে এল এই খবর। আশ্চর্য ভাবে এই পরিবর্তন। ফাদাররা ছুটল গির্জায়। তারা মেরীর সামনে উপাসনায় বসে গেল। তাঁরই ক্ষমতায় যে এই অলৌকিক পরিবর্তন, এ যেন তারা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে।

বাদশাহ মহিষী মরেন নি, বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন সম. পর্তুগীজদের। এবার বাদশাহের আর এদিকে মন থাকবে না। তিনি পত্নী বিয়োগের বেদনায় মুহ্যমান হয়ে শোকে বিহ্বল হবেন। তারপর হয়ত একদিন পর্তুগীজদের ওপর ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন তা ভুলে যাবেন।

ভুলে না যান, এখন তো কিছু কালের জন্য সব বন্ধ। এখন এদিকে নিশ্চয় মাথা ঘামাবেন না। সেই ভেবেই সকলে খুশি হল। তাতেই আনন্দ উৎসবের আয়োজন হল। তবে উৎসবটাও যাতে বাইরে বেরিয়ে না পড়ে তার জন্যে ডি মিলো সৈনিকদের কড়া হুকুম দিল।

বাদশাহের মহিষী মারা গেছেন। এ দেশের সম্রাট, তাঁর প্রিয়তমা পত্নী। এ দেশের প্রজা হয়ে এতটা স্পর্ধা নিশ্চয় বাদশাহ সহ্য করবেন না।

তাছাড়া তারা আনন্দ করছে, মহিষীর মৃত্যুর জন্তে নয়, মহিষীর সঙ্গে তাদের কোন শত্রুতা নেই। তাদের আনন্দ একটা দারুণ ভাবনা থেকে সমস্ত পর্তুগীজরা কিছুকালের জন্তে মুক্তি পেয়েছে বলে।

মাইকেলও খুশি। সারারাত সে ভেবেছে। ডিউটি দিতে দিতে এই সকালেও ভাবছিল। হীরাকে সে কেমন করে বাঁচাবে? কাউকে এ কথা বলার নয়। বলে যে উপদেশ নেবে তারও উপায় নেই।

ফেডরিক ঘুরছে। এক চোখের শ্যেণদৃষ্টি নিয়ে ঘুরে চলেছে। ওপাশে ব্যাণ্ডেল গির্জার ওখানে ডি মিলোর চর। প্রতিটি এদেশীয় মেয়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি দিচ্ছে।

এই সব দেখে মাইকেল কিছু আর ভাবতে পারছিল না। বুঝতে পারছিল, হীরাকে সরাবার আর কোন উপায় নেই।

বারবার মনে পড়ছিল হীরার মুখটি। আর কষ্ট পাচ্ছিল। হীরা ধরা পড়লে কারও ক্ষতি হবে না, তার হবে। আবার মনে হচ্ছিল কেন হীরা ধরা পড়বে? তার কি শরীরে পর্তুগীজ রক্ত নেই? এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই ডিউটি দিচ্ছিল।

এই সময় সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু খবর এল।

ডিউটি দিতে দিতেই সে সেই আনন্দ সাগরে ডুবে গেল। কতক্ষণে হীরার কাছে যাবে তাই ভাবতে লাগল। হীরা নিশ্চয় এতক্ষণে খবর পেয়েছে। অন্তত কিছুকালের জন্তে ভাবনা নেই। তবু হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও চলবে না। হীরাকে এখান থেকে এই অবসরে সরাতে হবে। ডি মিলো যদি একবারও হীরার কথা জানতে পারে, তাহলে সম্রাটকে খুশি করতে আর এতটুকু দ্বিধা করবে না। হীরাকে নিয়ে সে পালাবে। হীরাকে বিয়ে করে কোথাও এই বাংলা দেশের মধ্যে লুকিয়ে যাবে কিন্তু কি করে যাবে সে জানে না। সেই চিন্তাই সে উৎসবের মধ্যে করতে লাগল। তারপর ডিউটি খতম হল। স্যামুয়েলের বাড়ী গেল। হীরাকে দেখল। হীরার দিকে তাকিয়ে সে হাসল।

হীরা কিন্তু আগের মত পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে হাসল না। কেমন যেন গত রাত্রের পরিবর্তনে তার মুখের হাসি কে শুষে নিয়েছে?

মাইকেল আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, অতো ভাবনার কি আছে? এখন তো কিছুদিন আর এ নিয়ে কোন আলোচনা হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, আমার ওপর যখন নির্ভর করেছ তখন আর কিছু ভাবতে হবে না।

হীরা ম্লান হাসল মাইকেলের কথায়।

এমনি ভাবে মাইকেল সান্ত্বনা দিয়ে চলল। তারপর দু পাঁচ দিন আরও এমনি ভাবে বিদায় নিল। এদিকে মাইকেল উপায় ভেবে চলেছে, আর ডি মিলো, ফেডরিকও দিগো রিবেলীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে রেখেছে।

ডি মিলো কেমন যেন অন্য কাজে ব্যস্ত। ফেডরিক আবার জাহাজ নিয়ে গেছে। আর দিগো রিবেলী পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে যেন সুস্থ নেই। মদ আগেও খেত, এখন যেন আরও বেশি মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে পথ চলতে লাগল।

ডি মিলো সেই বিদ্রোহী ব্যবসাদারদের ধরে এনে পঞ্চাশ ঘা করে চাবুক লাগাল। সেই নিয়ে কিছু আন্দোলন। হুগলী উপনিবেশে একটা চাপা হট্টগোল জেগে থাকল।

আবার একদিন সব সহজ গতিতে চলতে লাগল। তবে দাসবাজার সেই আগের মতই সরব হয়ে রইল। এই বাজারের যেন মন্দা নেই। এই ব্যবসার যেন কোন শেষ নেই। দস্যু বণিকরা প্রত্যহই কিছু না কিছু দাস নরনারী ধরে নিয়ে আসে।

পর্তুগীজ দস্যুবণিক অনেক। তাদের জাহাজ ঘুরছে ভারতের নদী পথে যত্র তত্র। গ্রাম উজাড় করে ঘর জালিয়ে মানুষ ধরে আনতে তাদের কোন ক্লান্তি নেই। কখন যে কোন্ গ্রামের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে কে জানে? সে সময়ে মানুষের নিরাপত্তা দেবার ক্ষমতা কারও ছিল না। সকলেই গ্রাম বা নগরে প্রাণ হাতে করেই থাকত।

ফেডরিক মাঝে মাঝে জাহাজ নিয়ে ফিরে এসে ঘুরতে লাগল। সে এক চোখের দৃষ্টি নিয়ে খুঁজে চলে। সে যেন ভুলতে পারে না সেই মেয়েটিকে। ফেডরিকই মাঝে মাঝে ডি মিলোকে তাতায়, তাও দেখতে পায় মাইকেল।

মাইকেল ভাবছে, একটা কিছু পন্থা অবলম্বন করে হীরাকে নিয়ে সরে পড়তে হবে। হীরাকে সে আর স্যামুয়েলের বাড়ীর বাইরে নেয় না। তবু তার ভাবনার অন্ত নেই।

এখান থেকে একা পালাতেও ভয় করে। পর্তুগীজদের চোখ চারিদিকে। পর্তুগীজদের সে ভয় করে না। ভয় করে ফেডরিককে, আর দিগো রিবেলীকে। ওরা দুজনে জানে হীরাকে। হীরাকে দেখলে ওরা সনাক্ত করবে, এই সেই বাঁদী! সেই জন্যে যা কিছু ভয়।

হঠাৎ মনে পড়ল, দাক্রুজকে। দাক্রুজকে তার বিশ্বাস হল। ঐ একটি মানুষ যাকে নির্ভয়ে বলা যায় এবং যে ধর্মের জন্যে, জাতির জন্যে কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না। বরং তার কাছে সে সাহায্য চাইলে পেতে পারে।

মাইকেল দাক্রুজকে বলবে বলেই ঠিক করল। তবু আরও সময় নিল। ভয়, যদি ফাদার দাক্রুজও বেইমানী করে?

হঠাৎ একদিন শুনল, সুবাদারের ভায়া হয়ে বাদশাহের আবার একখানি পত্র এসেছে। বাদশাহ লিখেছেন, 'আপনারা আমার ক্রীতদাসীকে ফেরৎ দেন নি। আপনাদেব ঔদ্ধত্য সীমাহীন। আমি সুবাদার কাশিম খানকে নির্দেশ দিয়েছি, তোপ দিয়ে যেন হুগলীর পর্তুগীজ উপনিবেশ উড়িয়ে দেওয়া হয়।'

এই চিঠি আসার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাধ্যক্ষ ডি মিলো যেন ক্ষেপে উঠল।

আবার দুর্গের সেই বড় হল ঘরটায় আলোচনা সভা বসল। লোক ছুটল গোয়াতে। বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তার জন্যে সৈন্য ও গোলা বারুদ দরকার। যা দুর্গে আছে তা পর্যাপ্ত নয়। আর পথে পথে ঘোষণা করে দিল, যে সেই বাদশাহের বাঁদীর খোঁজ দিতে পারবে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। হুগলীর অধিবাসীরা নতুন নতুন মেয়ের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

কেউ কেউ দু একজনকে দুর্গে ধরে নিয়ে এল। ফেডরিক নেই, সে জাহাজ নিয়ে আবার মানুষ ধরতে গেছে। দিগো রিবেরীকে বসিয়ে ডি মিলো সনাক্ত করতে লাগল।

মাইকেল ডিউটি ছেড়ে এগিয়ে এল। খুঁজতে লাগল ফাদার দাক্রুজকে। খুঁজতে খুঁজতে সে পেল দাক্রুজকে এক মাঠের মধ্যে। সে সেই বীজ ছড়িয়ে চলেছে।

ফাদার দাক্রুজের মুখে কেমন প্রশান্তি। যেখানে সমস্ত হুগলীর অধিবাসীরা ভাবছে সেখানে ফাদার দাক্রুজের মুখে ভাবনা নেই।

মাইকেল ভাবল হয়ত ফাদার শোনে নি বাদশাহের নতুন ঘোষণা। সে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ফাদারকে অভিবাদন করল, তারপর বলল, ফাদার তুমি শোননি বাদশাহের নতুন ঘোষণা! বাদশাহ সাফ জানিয়ে দিয়েছে তার বাঁদীকে ফেরৎ না দেওয়ার জন্যে তোপ দিয়ে পর্তুগীজ উপনিবেশ উড়িয়ে দেওয়া হবে।

দাক্রুজ প্রশান্ত মুখে এক টুকরো হাসি টানল, তারপর মাথাটা হেলিয়ে বলল, শুনেছি।

তোমার ভয় করছে না ফাদার?

ভয়? ফাদার আবার মৃদু হাসি মুখে টানল, তাবপর রৌদ্রভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, না।

বাদশাহ এই হুগলী কলোনী উড়িয়ে দিলে আমরা সবাই মরে যাব, তুমিও তো মরে যাবে ফাদার! তবু তোমার ভয় করছে না!

দাক্রুজ আবাব উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল—মৃত্যু তো একদিন আসবেই তার জন্যে ভয়ের কি আছে?

মাইকেল তাকিয়ে থাকল দাক্রুজের দিকে। বিশ্বাসও করল। সত্যিই এ মানুষের ভয় নেই। ভয় থাকলে তাহলে সে আর মাঠে বীজ ছড়াতে পারত না।

যে ভয়ে ব্যাণ্ডেল গির্জার ফাদাররা মেরীর সামনে বসে উপাসনা করতে শুরু করে দিয়েছে, যে ভয়ে পল্লীতে পল্লীতে কান্নার রোল উঠেছে, সেখানে এই মানুষ মৃত্যু ভয়ে ভীত না হয়ে সে অবিচলিত ভাবে নিজের প্রত্যহের কাজ করে চলেছে।

ফাদার দাক্রুজকে লোকে বলে পাগল। অন্য ধর্মযাজকরা বলে বিশ্বাসঘাতক কিন্তু অনেকেই জানে, ফাদার এমন একজন মানুষ, যা কারুর সঙ্গে মেলে না।

মাইকেল সেইজন্যে ছুটে এসেছে এই ফাদারেব কাছে। সে পারে একমাত্র বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। দাক্রুজ আবার এগিয়ে গিয়ে বীজ ছড়াচ্ছিল। তার যেন কোন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই। এই মাত্র যা শুনল তাও যেন কথার কথা। আতঙ্ক তো নয়, প্রত্যহের কাজেও কোন শৈথিল্য নেই।

মাইকেল আবার দু পা এগিয়ে গেল। আর যে সময় নেই। হীরাকে আজ না সরাতে পারলে ঠিক ধরা পড়বে। বলল, ফাদার, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

দা ক্রুজ নীল চোখে তাকাল। চোখের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

মাইকেল হীরার সম্বন্ধে সব কথা বলে গেল। এতটুকুও গোপন করল না। শেষে বলল, নিজের ইচ্ছা। ফাদার তুমি যদি আমাকে সাহায্য না কর তাহলে কমাণ্ডারের হাতে হীরাকে তুলে দিতে হবে, কিন্তু প্রাণ থাকতে আমি তা পারব না। হীরাকে আমি বিয়ে করব, হীরাকে নিয়ে ঘর বাঁধব।

দাক্রুজ সব শুনে উদাস চোখে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছু বলল না দেখে মাইকেল আবার ছটফট করে উঠল, ফাদার আমি বড় নিরুপায় হয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে না?

ফাদার অনেক পরে কথা বলল, তুমি কি সাহায্য চাও বলো?

ফাদার, আমি জানি না। তুমি যা বলবে তাই আমি মেনে নেব।

হঠাৎ দাক্রুজ অস্ফুটকণ্ঠে বলল, বিপদে মানুষকে সাহায্য করা মানুষের ধর্ম। তারপর বলল, বাদশাহের ক্রীতদাসী কি সেই, যে স্যামুয়েলের বাড়ীতে আছে?

মাইকেল মাথা নাড়ল।

দাক্রুজ বলল, চলো, আগে তাকে সরিয়ে রাখি।

ওরা দ্রুত স্যামুয়েলের বাড়ীর পথ ধরল।

স্যামুয়েল বাড়ী ছিল না, মারিয়ার সঙ্গে দেখা হল, সে মাইকেলকে দেখে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, মাইকেল, সত্যি করে বলতো, হানা কে? হানা কি সেই মেয়ে, যার জন্যে আমাদের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে?

এ কথা কেন বলছ মারিয়া?

আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। স্যামুয়েল গেছে সেনাপতি ডি মিলোর কাছে। যদি সেই হয়, তাহলে আমরা বাঁচবার জন্যে তাকে ধরিয়ে দেব।

মাইকেল হাসবার চেষ্টা করল, কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইল কিন্তু সহজ না হতে পেরে শুধু বলল, তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে! সবাইকে তোমরা বাদশাহের ক্রীতদাসী ভাবছ!

দাক্রুজ তখন হীরাকে সঙ্গে নিয়ে অনেক দূর চলে গেছে।

মাইকেল বেরিয়ে এসে কোথাও না তাদের দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল। তারপর সেও দুর্গের দিকে এগিয়ে চলল। পথে দেখা স্যামুয়েলের সঙ্গে। স্যামুয়েল তাকে দেখেই গম্ভীর হল। তারপর বলল, মাইকেল, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

বলো। মাইকেল হাসবার চেষ্টা করল।

হানা যে সেই ক্রীতদাসী, তুমি জানতে না!

মাইকেল আশ্চর্য হবার ভাণ করে বলল, কই না।

হানার লুকিয়ে লুকিয়ে কান্নাতেই আমরা বুঝতে পেরেছি। সেনাপতিকে সেই কথা বলে এলাম। তিনি বললেন, মেয়েটাকে নিয়ে আসতে। তা তোমার জিনিস, তুমি গচ্ছিত রেখেছ, আমরা কেমন করে নিয়ে যাই? তুমি যদি হুকুম দাও তাহলে ফোর্টে নিয়ে যেতে পারি।

মাইকেল ভাবল, একবার বলে, নিয়ে যাও, আবার কি ভেবে বলল, স্যামুয়েল তোমাকে একদিন যথেষ্ট সাহায্য করেছিলাম মনে পড়ে? সেদিন যদি তোমাকে সাহায্য না করতাম তাহলে তোমার জীবন বিপন্ন হত। হানা যদি সত্যিই সেই মেয়ে হয়, তাহলে তুমি কি সাহসে আমার নির্বাচিত পাত্রীর বিষয়ে কমাণ্ডারকে বলতে গেলে?

স্যামুয়েল অস্থির হয়ে বলল, অন্যায় কি? আজ একটি মেয়ের জন্যে আমরা মরতে বসেছি। যদি হানা সেই মেয়ে হয়, তাহলে বাদশাহকে ফেরৎ দিলে নিশ্চয় আমরা বেঁচে যাব। তুমিও পর্তুগীজ। তোমারও দেশের স্বার্থ দেখা উচিত।

মাইকেলের ইচ্ছে করল স্যামুয়েলকে একটা চড় মারে। তারপর কি ভেবে ব্যঙ্গ করে বলল, বন্ধুত্বের অদ্ভুত প্রমাণই তুমি দেখালে! বেশ ভাল নিরাপদ জায়গাতেই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। মাইকেল ঘৃণার দৃষ্টিতে স্যামুয়েলের দিকে তাকিয়ে পথ চলতে লাগল।

স্যামুয়েল চিৎকার করে বলল, হানাকে নিয়ে কি করব বলে গেলে না তো!

মাইকেল মুখ ঘুরিয়ে বিকৃত কণ্ঠে বলল, যা খুশি তাই করতে পারো, আমার কোন কিছুতেই আপত্তি নেই।

মাইকেল তখন নদীর তীরে ফিরে এল। সে এবার নিশ্চিন্ত। ফাদারের হাতে যখন হীরা গেছে তখন আর ভাবনার কিছু নেই।

পড়ন্ত বেলা নেমে আসছে। বেচা কেনা সারা, ভিন দেশের নৌকা বাড়ীর পথে পাড়ি দিতে শুরু করেছে।

রণতরী সাজানো হচ্ছে। সৈন্যেরা আর বসে নেই। গুদাম থেকে গোলা বারুদ বের করে আনছে। যুদ্ধ সাজে তৈরি হচ্ছে হুগলী উপনিবেশ।

তবু ভয়, এ আর কি হবে? বাদশাহের বিস্তৃত মুঘল বাহিনীর কাছে এদেশের পর্তুগীজরা নগণ্য। একটি সাম্রাজ্যের কাছে একটি ক্ষুদ্র শক্তির হাত পা ছোঁড়া শুধু শিশু সুলভ। তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই।

মাইকেল দেখতে লাগল, ফাদাররাই কত মেয়ে ধরে এনে দিগো রিবেলীর সামনে উপস্থিত করছে।

ডি মিলো তাকে খাতির করে ড্রিঙ্ক এগিয়ে দিচ্ছে। দিগো রিবেলী মদে চুর হয়ে মাথা নাড়ছে। মাঝে মাঝে নেশাজড়িত কণ্ঠে বলছে, একবার তাকে পেলে হয়, সে আমাকে ছুরি দেখিয়ে পালিয়েছিল। আমাকে বলেছিল, বুড়ো। দিগো রিবেলীর কষ বেয়ে মদের গ্যাঁজলা গড়িয়ে পড়ছে। সে লাল চোখে মেয়েগুলোর দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মাইকেল আবার বেরিয়ে এল দুর্গ থেকে। তার ভয় করতে লাগল, স্যামুয়েল বাড়িতে গিয়ে হীরাকে না পেয়ে যদি ডি মিলোকে এসে তার নাম বলে দেয়! দাক্কুজ আসছিল। তাকে দেখে মাইকেল তার কাছে এগিয়ে গেল।

দাক্রুজ তাকে দেখে চাপাকণ্ঠে একটা জায়গার নাম বললো। আরও বলল,

সন্ধ্যের আগেই সেখানে পৌছবে। বিয়ের সব আয়োজন হচ্ছে, বিয়ে শেষ করেই এখান থেকে তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। নৌকারও ব্যবস্থা হয়েছে। ফাদার দাক্রুজ তারপর অন্য পথে চলে গেল। তারপর আঁধার নামতে লাগল। পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়ল।

মাইকেল এগিয়ে চলল চণ্ডীপুর গ্রামে। পাশেই চুঁচুড়া, সেখানেও একটি গির্জা ছিল। সেই চুঁচুড়াতেই চণ্ডীপুর গ্রাম। মাইকেল দ্রুত এগিয়ে চলল। শুনল, আজ রাত্রেই নাকি সুবাদার কাশিম খান হুগলী আক্রমণ করবে।

আজই সরে পড়তে হবে এখান থেকে। যাবার সময় ফাদারকেও নিয়ে যেতে হবে। মনে দারুণ উত্তেজনা, মাইকেল চেনা পথই কতবার ভুল করল। বিশ্বাসঘাতকতা সে করবে! এ ছাড়া উপায়ই বা কি? হীরাকে সেনাপতির হাতে তুলে দিতে মন চায় না। হীরাকে সে ভালবেসেছে। হীরাকে ছাড়া সে চিন্তা করতেই পারে না। সেই হীরার জন্যেই আজ সে দেশের শত্রু হয়ে উঠল। না আর ভাববে না। জগতে প্রণয়ের জন্যে অনেক ঘটনা ঘটেছে। এও একটা দৃষ্টান্ত থাকবে। শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে মেঠো পথ ধরে, গাছ গাছালির ভেতর দিয়ে মাইকেল দ্রুত এগিয়ে চলল।

ফাদার দাক্রুজ যে কথা অতি সহজে বুঝল, তার বুঝতে এখনও দ্বিধা। পর্তুগীজ হয়ে পর্তুগীজদের সর্বনাশ করতে মনে যেন কেমন লাগছে। তবু হীরাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে সে পারবে না।

হীরা বলেছিল, আমি আর ভাবতে পারি না। তুমি যেটা ভাল হয় কর। তুমি যদি মনে কর, আমাকে সঁপে দিলে তোমরা সর্বনাশ থেকে বাঁচবে, আমি না করব না। হীরা যে কত ভাল এই দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ।

মাইকেলের মনে আছে, দিগো রিবেলীর বাড়ী থেকে যখন পালাচ্ছে তখন তার দেখা পেতেই বলেছিল, 'মুরোদ নেই শুধু দেখার সাধে আত্মহারা। ছিলে কোথায় বাপু কাল…'

হীরা ভীষণ হাসত। আজকাল হাসে না। আজকাল যেন হাসি শুকিয়ে গেছে। সেই মেয়েকে ধরিয়ে দিলে অনুতাপ হবে না!

না, না এসব কি সে ভাবছে? হীরাকে ধরিয়ে দেবার মতলব মনে আসছে কেন? তবে কি তার ভালবাসার কোন দাম নেই? আকর্ষণ যেটুকু তা ঐ বাহ্যিক ভাল লাগা? কিছুই বুঝতে পারল না মাইকেল। ধোঁয়াটে পথ ধরে এগিয়ে চলল।

তারপর চণ্ডীপুর গ্রামের ছোট্ট খোড়ো চালের গির্জা ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে হীরাকে দেখতে পেল না। দুজন ফাদার তাকে অভিবাদন জানাল। তারপর ফাদার দাক্রুজ এল। দ্রুত বিয়ের আয়োজন হল। হঠাৎ কোথা থেকে যেন খৃষ্টান মেয়ের মত সাজিয়ে হীরাকে আনা হল। সঙ্গে দুজন মেমসাহেব। হীরাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। সাদা সিল্কের গাউন পরণে। মাথায় কনের মত ঘোমটা টানা।

মোমবাতি জ্বলছে অনেক! সেই মোমবাতির জোরালো আলোর সামনে

হীরার পাশে গিয়ে মাইকেল দাঁড়াল। ফাদাররা মন্ত্র পড়তে লাগল। হঠাৎ গর্বে মাইকেলের বুক ভরে গেল। ভালবাসার সার্থকতা পরিণয়ে সমাপ্তি হয়। যদি সেই ভালবাসায় সার্থকতা থাকে।

তাদের পরিণয় সমাপ্ত হল। পৃথিবীর দুই দেশের মানুষ নয়, দুটি শাশ্বত নরনারী। তারা পরস্পরকে ভালবেসেছিল, তাই এই মিলন সার্থক হল। কটি মুহূর্তের মধ্যে মোমবাতি প্রজ্জলিত শিখার সামনে দাঁড়িয়ে মাইকেল প্রতিজ্ঞা করল, আজ থেকে হীরার সব ভার আমি নিলাম। সমস্ত আপদ বিপদ থেকে তাকে আমি সারাজীবন রক্ষা করব। বিয়ে শেষ হয়ে গেল।

ফাদার আর এতটুকু সময় দিল না তাদের অপেক্ষা করতে। ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নিয়ে গিয়ে নদীর ধারে তুলল। সেখানে ব্যবস্থা করাই ছিল। পাড়ে নৌকা বাঁধা। সেই নৌকায় দুজনকে তুলে দিয়ে ফাদার চাপাস্বরে বলল, পশ্চিম দিকে জোর দাঁড় টেনে চলে যাও, আজই সুন্দরবনের মধ্যে ঢুকে পড়বে। তবে ভুলেও পূবদিকে যাবে না, তাহলে হুগলী বন্দরে ধরা পড়বে মাইকেল বলল, ফাদার, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। আজই হয়ত বাদশাহের সৈন্য হুগলী আক্রমণ করবে।

ফাদার দাক্রুজ আবার সেই মৃদু হাসি ঠোঁটের কোনায় আনল। তারপর বলল, তোমরা যাও। তোমরা বাঁচলেই আবার নতুন মানুষ জন্ম নেবে।

ফাদার জলে নেমে নৌকো ঠেলে দিল। আর কোন কথা হল না। মাইকেল দাঁড় ধরে বসল।

নৌকো উত্তাল ভাগীরথীর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল। হীরা মাথা নিচু করে বসেছিল। মাইকেল কয়েকবার তার দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না।

চাঁদের আলো পড়েছে জলের ওপর। হীরার চোখেও আলো। কে যেন তাকে বিয়ের সাজে সাজিয়ে দিয়েছিল। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল।

মাইকেল জোরে জোরে দাঁড় বাইছে। মনের অনেক দুর্ভাবনা গেছে। এখন কোন নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। হঠাৎ দূর থেকে তোপ দাগার শব্দ কানে এল। মুহূর্মুহু তোপ দাগা। যেন এক সঙ্গে আকাশটা ভেঙে পড়ল। অন্ধকার আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে লাগল। আর মানুষের গগনভেদী চিৎকার। বাদশাহের সৈন্য হুগলী আক্রমণ করেছে।

মাইকেল দাঁড় বহা বন্ধ রেখে পূর্বদিকের লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ যেন কি তার হল? পূবদিকেই নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে জোরে জোরে বাইতে লাগল।

হীরা প্রথমে বুঝতে পারল না মাইকেলের মতলব। হঠাৎ সে বুঝতে পেরে আর্তস্বরে চিৎকার করে বলল, এ তুমি কোথায় যাচ্ছ মাইকেল?

মাইকেল তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। জোরে জোরে দাঁড় বেয়ে বেয়ে সে এগিয়ে চলল।

মাইকেল, এ তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

তোপের শব্দে হীরার কথা হারিয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ মাইকেল হা হা করে হেসে উঠল। কেমন যেন উন্মাদ একটা মানুষ, পাগলের মত বলল, জাতিকে ও দেশকে রক্ষার জন্যে তোমাকে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছি।

স্তব্ধ হীরা। দু'চোখে জল। তার মুখে আর কোন কথা নেই। মাথা থেকে অবগুণ্ঠন খসে পড়েছে। একসময় বলল, মাইকেল, আমি যে তোমার স্ত্রী। আমাকে তুমি ধরিয়ে দিয়ে জাতিকে বাঁচাবে ?

ওরা হুগলী বন্দরের অনেক কাছে চলে এসেছিল। তোপ ফাটার শব্দে ও আগুনের ভয়ঙ্কর আলোয় সে এক বীভৎস পরিস্থিতি।

চতুর্দিকে গোলা ফাটছে। আগুনের ফুলকি বাতাসে ছুটছে। ঘর বাড়ী জ্বলছে। মানুষের চিৎকার উঠছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার। হঠাৎ একটি গোলা এসে মাইকেলের নৌকায় পড়ল। নৌকাটা শূন্যে উঠে চৌচির হয়ে ফেটে গেল।

কোথায় বা হীরা, কোথায় বা মাইকেল। তখন সেই হুগলীর পর্তুগীজ উপনিবেশে শুধু মৃত্যুর মরণোৎসব। আর ভাগীরথীর স্রোতে তখন কি এক দামাল রূপ।

ঐতিহাসিক সেই যুদ্ধ তিন মাস ধরে চলেছিল।

সম্রাট শাহজাহান হুগলী থেকে পর্তুগীজদের চিরতরে নির্বাসন দিয়েছিলেন। কত মৃতদেহ ঐ ভাগীরথীর স্রোত দিয়ে বয়ে চলেছিল। তার মধ্যে হীরার মৃতদেহ খুঁজলে বোধ হয় পাওয়া যেত। আর মাইকেল! না, মাইকেলের কথা থাক্।

মাইকেল শেষ মুহূর্তে কেন এই চেয়েছিল ? জাতিকে সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভালবাসাকে কেন রক্তাক্ত করেছিল ? কিন্তু কে তার উত্তর দেবে ?

আরও বহু বছর পরে পর্তুগীজরা আবার ব্যাণ্ডেল গির্জা স্থাপন করেছিল। ফাদার দাক্রুজ সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে হুগলীতে ৭৭৭ বিঘা জমি পর্তুগীজদের জন্যে পেয়েছিল। আবার স্থাপনা করেছিল তার আওয়ার লেডিকে। দাক্রুজ জানত, হীরা ও মাইকেলকে সরিয়ে দিয়ে সে এক মহৎ কাজ করেছে। মহতী পরিকল্পনা কিন্তু পরের ঘটনা সে জানত না।

আজ যেন সেই ব্যাণ্ডেল গির্জায় গেলে সেই হীরাকেই বার বার মনে পড়ে। মাইকেল কেন শেষপর্যন্ত এমনি কাজ করল ? হীরাকে সুখী করতে সে কি দেশের শত্রু হতে পারত না ? কিন্তু তারও জবাব কে দেবে ? দেবে কি দাক্রুজের ছড়ানো বীজে সৃষ্টি হুগলীর মাটিতে বেড়ে ওঠা ঐ লক্ষ লক্ষ সেই কৃষ্ণকলি ?

এ পথ দিয়ে এখনও চলে যেন কেউ। চলে লীলা কৌতুকী, সন্তস্নাতা কিশোরী নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি। তার চলার ছন্দে বাজে মৃদঙ্গ। তার চলার ভঙ্গিতে ভাঙে অবহেলায় পড়ে থাকা গাছের শুকনো পাতা। কে সেই তন্বী তরুণী? কবির হৃদয় সরোবরে আনন্দ স্নানে ধন্যা হয়ে চাঁদের মত আকাশের পটে উজ্জল হয়ে আছে!

'পীরিতি পীরিতি কি রীতি মূরতি হৃদয়ে লাগল সে
পরাণ ছাড়িলে পীরিতি না ছাড়ে পীরিতি গড়ল কে॥'

এ বুঝি কোন এক যুগের কথা নয়। যুগের পর যুগ ধরে সেই একই কথা ঘুরে ফিরে আসে। প্রজাপতি ফুলের বৃন্তে বসে। রঙে রঙে পৃথিবী নতুন রঙে বিভোর হয়।

নান্নুরের এই পথে এখনও কেউ এলে থমকে দাঁড়ায়। ছায়া-ছায়া নিস্তব্ধ পল্লীটা যেন পাখীর মুখর তানে আবার সরব হয়ে ওঠে। 'ঠাকুর এ আমার কি হল? একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।' সেই বিস্মৃতিপ্রায় যুগের কথা যেন আবার দুটি কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়ে পাপীয়ার তানে তানে মুখর হয়ে ওঠে।

লুব্ধ পথিকের দল এসে দাঁড়ায় চোখে বিস্ময় নিয়ে। ছায়াঘন সেই শান্ত পল্লীটা দ্বিপ্রহরের নিঝুম ক্লান্তিতে আবার চমকে চমকে ওঠে। আবার সে শুনতে পায় বক্তার মুখের কথা। এখানেই রজকিনী রমণী কাপড় কাচত, এই সেই পাটা। আর ঐ দূরে চণ্ডীদাস পুকুরের পাড়ে বসে মাছ ধরতেন।

বক্তার মুখে আর কথা সরে না। লুব্ধ পথিকের দল স্তব্ধ বিস্ময়ে কি কথা ভেবে যেন নির্বাক হয়ে যায়। যেন মানসচক্ষে দেখতে পায় নিটোল যৌবনবতী একটি মেয়ে কোমরে নীল শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে জলের ওপর পা দু'খানি মেলে দিয়ে পাটার ওপর কাপড় আছড়ে চলেছে। দুলছে সমস্ত নিটোল অঙ্গ। চোখে তার কটাক্ষ। দূরে তাকিয়ে আছে বঙ্কিম ভুরুতে রাজ্যের এক বিস্ময় নিয়ে। ঠোঁটে হাসি চাপছে। চাপা ঠোঁটের ভেতর থেকে যেন রৌদ্রের কণা রেণু রেণু হয়ে ঝরছে।

আর ওপাশে গাছের ছায়ার নীচে যে বসে মাছ ধরছে, তার গৌরবর্ণ দেহের শুভ্র উপবীত যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তার লক্ষ্য জলের ওপর। কিন্তু মাঝে মাঝে চোখ চলে যাচ্ছে কোথায় যেন? দূরে শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে যে পাটার ওপর কাপড় কাচছে তার সামনে এসে থামছে। চারি চোখে দৃষ্টি মিলছে। ক্লান্তিতে রজকিনীর কপোল বেয়ে স্বেদবিন্দু নামছে। মুখে কাপড় আছড়ানোর জলের ফোঁটা। তবু ঠোঁটে ঠোঁট চাপা হাসি।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহু আগে নান্নুরের এই পল্লীতে এমনি এক ঘটনাই ঘটেছিল। চণ্ডীদাস ও রামী। রজকিনী রামী। রজক ঘরের এক মেয়ে বিশালাক্ষী দেবীর পূজারী এক ব্রাহ্মণের প্রেমে পড়েছিল। আর সে প্রেম অমর হয়ে আছে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রতি ছত্রে ছত্রে সেই প্রণয়ের জয়োগান। পরবর্তীকালে আচারনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকে রজকিনী রামীর নামটি নিঃশেষে মুছতে চেয়েছিলেন কিন্তু যাকে দেখে চণ্ডীদাসের মধ্যে প্রেরণা, কবিতা লেখার উৎস, যার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'জানি না, কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বাঁধে। মরমের কাহিনী ভাষার অতীত। মুখেতে না সরে বাণী প্রাণ মোর কাঁদে। প্রতিকারের উপায়ও থাকে না। যে এ দশা করিয়াছে সে নিষেধ মানে না।'

আজ সেই চণ্ডীদাসকে নিয়ে কত না কাহিনী, কত বিস্ময়!

রামী বুঝি না থাকলে চণ্ডীদাসের পদাবলী অমর হত না। রামী জীবনে না এলে বুঝি চণ্ডীদাস কবিতাই লিখতে পারতেন না।

অথচ চণ্ডীদাস কি জানতেন, রজক ঘরের মেয়ের কাছে তার জীবন, যৌবন সবই বাঁধা পড়বে?

বীরভূমের এই নিরালা পল্লীতেই চণ্ডীদাসের জন্ম। ফুল যেখানে আপনি ফোটে, পল্লীর স্নিগ্ধ ছায়াশীতল মমতায়, আপন স্বভাবে ও প্রকৃতির সোহাগে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। বিশালাক্ষীর মন্দিরে দেবীর সামনে প্রত্যহ পূজায় বসতেন। পূজা সমাপ্তে গিয়ে বসতেন বাড়ারই একান্তে পুষ্করিণীর ধারে মাছ ধরবার জন্যে।

হঠাৎ একদিন দেখেন রামীকে।

কে জানত এই রজক ঘরের মেয়ে একদিন এক প্রতিভাবানের সৃষ্টির মাঝে চির অমর হয়ে যাবে। অথচ রামী থাকত কাটোয়া অঞ্চলের তেহাই নামক গ্রামে। পিতৃমাতৃহীন হয়ে রামী চলে আসে নান্নুরে এক আত্মীয়ের বাড়ি।

চণ্ডীদাস ছায়াঘন গাছের তলায় বসে তাকান অপরিচিতার দিকে। বুঝতে পারেন না এ কে?

রামী পুকুরে এসে পাটার ওপর কাপড় ফেলে আছড়ায়। দেহ নানা ছন্দে বাঁক নেয়। আবার চলে যায় কাপড় কেচে নিয়ে জলসিক্ত কাপড়ে।

চণ্ডীদাস বিস্ময়ে ভাবেন। বুকের মধ্যে যেন তার কি করে ওঠে?

পরের দিনও এমনি। রামী আসে বেলা গড়িয়ে এলে ঘাটে। তার হাতে ময়লা কাপড়ের বোঝা। সে কাপড়ের বোঝা হাতেই তাকায় চণ্ডীদাসের দিকে। তারপর মুখ নামিয়ে নিয়ে কি যেন ঠোঁটে চেপে এক মনে কাপড় কাচতে থাকে।

কখন তন্ময়তার ঘোরে চণ্ডীদাস নিজের মধ্যে হারিয়ে গেছেন জানেন না। হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠেন নারী কণ্ঠস্বরে—ঠাকুর, তোমার ছিপে কি আর মাছ পড়বে?

সচকিত হয়ে ওঠেন চণ্ডীদাস। ছিপটি তুলতে গিয়ে দেখেন ছিপের সুতো ছিঁড়ে মাছ কখন পালিয়েছে।

দাঁড়িয়ে আছে রামী জলসিক্ত বসনে। চোখ ভরে দেখছে চণ্ডীদাসকে।

সেদিন চণ্ডীদাস কিছু বলেন নি, বলতে পারেনও নি। রামীও তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন যেন পিছু হটে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল তুজনার কেউ জানে না। হঠাৎ একদিন রামী ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল চণ্ডীদাসের কোলের ওপর।

রামী বলল—ঠাকুর, এ আমার কি হল ?

চণ্ডীদাসের মুখে কথা নেই।

বিশালাক্ষী মন্দিরে দেবীর সামনে পুজোয় বসেন চণ্ডীদাস। গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করেন। কিন্তু চোখের সামনে যেন রামীর মুখ ভেসে ওঠে।

তাদের এ মেলামেশা গ্রামবাসীর চোখে গোপন থাকে না। সমাজপতিরা চণ্ডীদাসের পাতিত্য ঘটেছে বলে ঘোষণা করেন। প্রায়শ্চিত্ত না করলে এ দোষ মুক্ত হবে না।

উৎসবের সমারোহ প্রাঙ্গণে চণ্ডীদাস বসে আছেন। প্রায়শ্চিত্তের জন্যে সমাজপতিরা উদগ্রীব। এই সময়ে রামী ছুটে আসে সেই উৎসব প্রাঙ্গণে। চণ্ডীদাসের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে বলে—ঠাকুর, তুমি নাকি আমাকে ভালবেসে পতিত হয়ে গেছ ?

চণ্ডীদাসের মধ্যে এই প্রশ্নেরই সমাধান হচ্ছিল না কিছুতে। সে সমাধানের পথ যেন রামী এসে উৎসব প্রাঙ্গণে সহজ করে দিল। সমাজপতিরা দেখলেন তুটি হৃদয়ের আকুলতা। তবু যেন কোথায় থাকে দ্বিধা। সমাজের উচ্চনীচ ভেদাভেদের চুলচেরা হিসেব যেন এদের কিছুতেই এক করে নিতে পারে না।

কিন্তু চণ্ডীদাস তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। রচিত হতে লাগল চণ্ডীদাস পদাবলী। পদাবলীর প্রতি ছত্রে ছত্রে রজকিনী রামীর রূপ গুণ। চণ্ডীদাস লিখলেন—‘রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়।’

চণ্ডীদাসের গানে হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় অনুভূতির এমন এক ভাব বিহ্বলতা প্রকাশ পেল যে রামী নিজেই তন্ময় হয়ে তার স্রষ্টার দিকে তাকিয়ে থাকে।

চণ্ডীদাসের মধ্যে ছিল কবিত্ব শক্তি কিন্তু সে শক্তি স্ফুটনের মুখে এসে পাপড়ি মেলতে পারছিল না। রামীর সাহচর্য তাকে দিল সেই ফোটার প্রেরণা। অজস্র মুক্তার মত বাণীবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এল অমৃতময় সুধারস, চণ্ডীদাস গাইলেন—

‘নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী চমকি চাহিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী ততহি উদয় ভেল।’

রামী বলল—ঠাকুর, আমি সামান্য মেয়ে তুমি আমার মধ্যে কি দেখো ?

চণ্ডীদাস ডাকেন—রামী। রজকিনী রামী। তুমি রজক রমণী নও, তুমি আমার রমণী।

বিশালাক্ষী মন্দিরে পুজার আসনে বসে চণ্ডীদাস চোখের জলে ভাসেন। কি অপূর্ব এক ভাবাবেগ তাঁর মধ্যে খেলা করছে। শুধু ভাষা চাই।

রামী অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে তার দয়িতের দিকে। ছুটে চলে যেতে চায় তার মন। প্রাণ কেঁদে ওঠে কিসের যেন আকুতিতে।

চণ্ডীদাস একটি কীর্তনীয়ার দল গড়লেন। দলের সঙ্গে রামী।

তারপর নেমে এল এক অজানা বিপদ দুজনার মাঝে। কীর্তনের জন্যে ডাক পড়ল কীর্ণাহারে কিলগির খাঁর রাজসভায়। সেখানে রামীও সঙ্গে গেল।

রাজসভায় দলে দলে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি। চিকের আড়ালে বসে মেয়েরা।

গৌরকান্তি অনিন্দ্যসুন্দর চণ্ডীদাস। নিজের রচিত প্রেমের কাজলে ডোবানো কীর্তনের পদ। সুরে ও গানে বিভোর করে দিলেন রাজসভা।

কিন্তু চিকের আড়াল থেকে কে যেন মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে চণ্ডীদাসকে বরণ করলেন। চণ্ডীদাস জানলেন না তার কিছুই। রামীর হাত ধরেই রাজসভা থেকে অজস্র সুখ্যাতি বুকে তুলে নিয়ে প্রেয়সীর হাতে হাত জড়িয়ে পথে এসে নামলেন।

কিন্তু হঠাৎ সিপাই এসে চণ্ডীদাসের গতিরোধ করল। নিয়ে চলল চণ্ডীদাসকে সিপাইরা বন্দী করে।

যে রাজা একসময়ে তাঁকে অজস্র সুখ্যাতিতে ভূষিত করেছিলেন, হঠাৎ তাঁর চোখে অগ্নিদীপ্তি জ্বলে উঠল। চণ্ডীদাস জানলেন, রাজার এক বিবি তাঁর প্রণয়াসক্ত।

কিন্তু কোন কিছু ভাবার আগেই রাজার বিচার হয়ে গেল। হাতীর সঙ্গে বেঁধে তাঁর মৃত্যু ঘটানো হবে।

রামী জানল না এসব কিছুই। তার মনে তখনও সেই কীর্তনের সুর। মনে ভাবাবেগ। সে বুঝতে পারে না রাজার লোকেরা কেন তার প্রিয়জনকে আবার নিয়ে গেল।

সেও ফেরে পিছন টানে। কীর্ণাহারের পথ দিয়ে চলতে চলতে তার র ় তনু যেন কি এক আনন্দে আরও রূপের পসরা মেলে। গুন গুন করে গান গায় কি কথা ভেবে যেন।

'থির বিজুরী বরণ গৌরী দেখিনু ঘাটের কূলে।'

তার চণ্ডীদাসের রচনা।

হঠাৎ তার স্বপ্ন ছুটে যায়। রাজবাড়ির সিংহ দরজার দিকে তাকিয়ে কণ্ঠের গানও থেমে যায়। হাতীর সঙ্গে বদ্ধ অবস্থায় তার প্রাণের প্রতিম। বুঝতে পারে না কিছু। ছুটে যেতে চায়। সিপাইরা তাকে বাধা দেয়। তারপর ভেঙে পড়ে মাটিতে চোখের জলে। ঠাকুর, এমন যে কিছু একটা ঘটবে এ তো আমি জানতুম! এত সুখ কি আমার এ জীবনে সয়?

চণ্ডীদাসের পদাবলী শুধু সত্য আর সবই আজ গল্প। চণ্ডীদাসকে নিয়ে আজ অনেক কাহিনী। নান্নুর শুধু বীরভূমে ছিল না। বাঁকুড়া জেলার ছাতনায়ও আছে। কেউ বলেন, তাঁর প্রণয়িণীর নাম শুধু রামী ছিল না। তার অনেক নাম, রাই, রাসমণি রামিনী অষ্টোত্তর শত নাম।

বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে বাজে আজও ঘণ্টা ঢং ঢং। কে যেন মেঘের কোল বেয়ে নীল শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে কোথায় চলে যায়। শুধু চমকই জাগে, আর সব বিস্মৃতি।